গুরু-নানক

শ্রীরাখাল দাস কাব্যানন্দ

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ ।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৩৪

মূল্য ১৷৹ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট

"নিউ সরস্বতী প্রেস" হইতে

শ্রীমিহির চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"হরিমে লাগি রহো রে ভাই।
বনৎ বনৎ বন যাই॥"

এই মহাবাক্য উদ্ঘোষিত করিয়া যিনি পতিত মানব-কুলকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহার পূত কাহিনী এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইল। গুরু নানক যেরূপ তপস্যা সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া পঞ্জাববাসীর ধর্ম্মপথ পরিষ্কার করেন, বহু অমূল্য সদুপদেশ-রাশি প্রদান করিয়া মানব-জাতির জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত করেন, তাহাতে তিনি কেবল মাত্র শিখ জাতির গুরুপদ-বাচ্য নহেন, পরন্তু সমগ্র মানব-সমাজেরই গুরুরূপে বরণীয়।

ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতে বহু বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা একতার ভাব, সহানুভূতির মিলন জাগিয়া উঠিয়াছে, এ কথাটা মানিতেই হইবে। এই একতা মিলনের প্রভাবে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মাগধ, সৌরাষ্ট্র সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী এক সূত্রে বাঁধা পড়িয়া পরস্পর ভাই ভাইয়ে আলিঙ্গন করিতেছে; ইহা ভারতবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে। বিজনে বিস্তীর্ণ ভারতের মধ্যে—বহু ভাষা-ভাষী—বহু ধর্ম্মের ধর্ম্মীর মধ্যে এমন একতা, এমন ভ্রাতৃভাব হিন্দু রাজত্বের কালেও ছিল না। মুসলমান শাসন সময়েও এমন হৃদয়স্পর্শী একতা বা সহানুভূতি দেখা যায় নাই। ইহা এই ইংরাজ শাসনেই জন্মিয়াছে। এখন বাঙ্গালীর প্রাণ পঞ্জাবীর জন্য কাঁদিয়া উঠে, মাদ্রাজীর মহারাষ্ট্রীর দুঃখে বিপ্রাণ

বিগলিত হয়। এখন ভারতের সকল বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করে। একের ভাব—একের ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সৎ—শুভকর—শিক্ষাপ্রদ তাহা অপরে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। বরং সেইরূপ আদান প্রদান হইতে ভারতের জাতীয়-জীবনের অভ্যুদয় কামনা করিয়া থাকে। এই কারণেই আজি বঙ্গের গৌরাঙ্গ যেমন শিখের নিকট সম্মান ও সমাদরের সামগ্রী, শিখের আদি গুরু নানক বাঙ্গালীর পক্ষে তেমনি পরম ভক্তির পাত্র, পূজনীয়।

ভারতের এই নবজাগরণের শুভ যুগে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে কেবল রাজনীতির সম্মিলন-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া পরিতৃপ্ত রহিলে চলিবে না, তাহাদের পরস্পরের ধর্ম্মভাব, নৈতিক তত্ত্ব আগ্রহে বুঝিয়া লইয়া সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই ভারতে সার্ব্বজনীন সম্মিলন, সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক ভেদভাব ঘুচিয়া, পূর্ণাঙ্গ একতায় পরিণত হইবে—তবেই সেই একতা, জাতীয় অভ্যুদয়ের মহামহীরুহ বিকশিত হইয়া জগতে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে।

বাস্তবিকই যদি আমরা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী বাঙ্গালী—পশ্চিম প্রান্তবাসী শিখ জাতিকে যথার্থরূপে বুঝিতে চাই—শিখকে ভ্রাতৃভাবে হৃদয়মাঝে আসন দিতে চাই, তবে তাহাদের ধর্ম্মভাব, নৈতিক চরিত্রের মূল উৎস খুঁজিয়া লইয়া, তাহাকে আপনার ভাবে বরণ করিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে ভারতের নবজীবনে একটা কথা উঠিয়াছে যে—'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়াই আমরা ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছি; এক ধর্ম্ম হইতেই হীনপ্রাণ ক্ষীণদেহ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ধর্ম্মের ভাবে বিভোর হইয়া [illegible] ইহ কালের সম্পদ-সম্ভোগ আদি যাহা কিছু সংসার-জীবনে

বাঞ্ছনীয়, সে সকলই বৈরাগ্য আর অবসাদের আঁধার-কূপে নিক্ষেপ করিয়াছি।

কথাটা কি সত্য? ইহা বেশ বিচার করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। যুক্তি চিন্তার সহিত বেশ বিচার করিলে বুঝা যায়, ধর্ম্মের পথে, কখন কোন জাতি অবসাদ অবনতি লাভ করে নাই, করিতেও পারে না। কারণ—ধর্ম্মই একমাত্র সংসারের শুভকর সামগ্রী। যাহা শুভকর, তাহার ফল কখনই অকল্যাণ ঘটাইতে পারে না।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥'

হে তাত! শুভকারিজন কখনই দুর্গতি পান না।

এখন কথা এই যে, ধর্ম্ম সামগ্রীটা শুভকর কি না? বাস্তবিক ধর্ম্ম, শুভ হইতে কোন পৃথক পদার্থ নহে। যাহা সৎ, যাহা কিছু শুভকর, তাহাই তো ধর্ম্ম। সংসারকে যাহা রক্ষা করে, বজায় রাখে, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা ছাড়া বা তাহা অপেক্ষা আর কোন্ জিনিষ শুভকর হইতে পারে? ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে—সংসারকে রক্ষা করিবার চেষ্টা। যাহা সংসারকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তাহাই তো অধর্ম্ম। তবে অনেক স্থলে ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে। ধর্ম্মের অনাচারে বা ধর্ম্মের ছলনায় অনেক স্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে ধর্ম্মের নিজের কোন দোষ ঘটিতে পারে না—তাহা সমাজ বা শ্রেণী বিশেষের দুর্গতি-দোষে ঘটিয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে, তেমনি জাতিগত জীবনের পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র উন্নতিকর, শুভপ্রদ বিষয়। ধর্ম্মে, কখনই তেজোবীর্য্যের বিবর্দ্ধন ব্যতীত অপচয় ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মে সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধ

সম্পদ-ঐশ্বর্য্যের সদ্ভাব ভিন্ন অভাব অসদ্ভাব কখন ঘটে না। হিন্দুশাস্ত্রের কথা—

'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। এ কথার সত্যতা সারবত্তা সর্ব্বত্রই সর্ব্বতো ভাবেই স্বীকার্য্য।

প্রকৃত পক্ষে পতন আমাদের ধর্ম্ম হইতে ঘটে নাই—অধর্ম্ম হইতেই ঘটিয়াছে। প্রকৃত যাহা সৎ শুভধর্ম্ম, তাহা সমাজের উন্নতি ও কল্যাণই সাধন করিয়া থাকে। আমাদের ধর্ম্ম যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সমন্বিত ছিল, তখন আমরা হিন্দুজাতি সাত্ত্বিক ছিলাম। ধৈর্য্য-বীর্য্যাদি শ্রেষ্ঠ গুণের শ্রেষ্ঠ আধার, আদর্শস্থানীয় তখন ছিল এক মাত্র হিন্দু। হিন্দু তখন জীবনে স্পৃহা করিত না—মরণে ভয় করিত না, স্থূল ভোগে আসক্ত হইত না। হিন্দু তখন জানিত—দেহ একটা খেলার ঘট, জীবন একটা সাধনার ক্ষেত্র বিশেষ।

হিন্দুর সে বীর্য্য নাই, ভারতের সে দিনও আর নাই। এখন হিন্দু তমোময় অবসাদ-গ্রস্ত-জীবন। ইহকাল, ইহকালের সম্ভোগ-সম্পদকেই হিন্দু এখন একমাত্র প্রাণের সামগ্রী বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। জীবনের একটা দিন খসিলে, সে পরমায়ু-সূর্য্য ডুবিয়া গেল ভাবিয়া ভয়ে জড়সড় হয়। সম্ভোগের সামগ্রী হইতে তিল পরিমাণ অপচয় ঘটিলে, সর্ব্বস্বান্ত হইল বলিয়া হাহাকার করিতে থাকে। এতই সামান্য তাহার মনের ভাব, এমনই সঙ্কীর্ণ তাহার হৃদয়। এই বিকট ভাব—বিকৃত দশা হইতে সে এমনই নীচমনা হইয়া পড়িয়াছে যে, তিল মাত্র ত্যাগের কথা শুনিলে সে অন্তরে শিহরিয়া উঠে।

সৎধর্ম্ম হইতে সুনীতির সমুদ্ভব। সুনীতি হইতেই চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই চরিত্রের বলে যে বলী, সেই প্রকৃত বলী। কি

জাতি হিসাবে—কি ব্যক্তিগত হিসাবে—যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, চরিত্রকে উন্নত জীবনের শ্রেষ্ঠ বা মূল উপাদান বলিয়া মানিতেই হইবে।

ধর্ম্মের গ্লানি হইতেই, উন্নত জীবনের মূল উপাদান যে চরিত্র-বল, তাহার মলিনতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় জীবনকে উন্নতি-অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করিতে হইলে চরিত্র-বিকাশের উৎসস্বরূপ ধর্ম্মকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবেই প্রয়োজন।

ভারতের আজি জাতীয় জাগরণের শুভদিন সমুদিত হইয়াছে। হিন্দু-ভারতের সর্ব্বদিকেই আজ সেই জাগরণের সাড়া সংঘোষিত হইতেছে। এখন আমাদের সকলকেই পরস্পরকে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইউরোপের ইতিহাসে, নবজাগরণের যুগ (Rennaisance) হইতে যেমন আন্তর্জাতিক (Internationalism) ভাব বিকশিত হইয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তেমনি প্রাচ্যের মধ্যে ধর্ম্মনীতির আদিম লীলাক্ষেত্র ভারতেও একটা আন্তর্জাতিক নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে আমাদের সকল সম্প্রদায়ের সকলকে বিশেষরূপে জানিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই জানা বুঝার প্রধান উপায় কি? যাঁহারা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণদাতা, তাঁহাদিগকে জানা বুঝা, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পন্থা ও তত্ত্ব বিশদ্‌ভাবে উপলব্ধি করাই তাহার প্রকৃষ্ট উপায়।

শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ।

গুরু-নানক।

অবতরণিকা।

গুরু-নানক শিখ জাতির আদি গুরু। তিনি শিখ জাতির মূল ভিত্তি। গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি শিখ সম্প্রদায়ের নেতা মহাজনগণ শিখ জাতির জাতীয়তাকে বিশেষ বলবতী করিয়া সুদৃঢ়ভাবে শিখগণের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহামতি ভগবদ্ ভক্ত নানক যে সেই শিখ জাতির জাতীয় জীবনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া যে একটী প্রবল বীর্য্যবান্ মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে—সেই পবিত্র পাদপের সুখশীতল ছায়ার আশ্রয়ে যে শিখ জাতি একতাসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র জগতের মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়ের অবসর নাই।

মহানুভব মহাপুরুষ নানক ভারতে এক অতি বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় ভিত্তি-স্থাপক। যে শিখজাতি একদিন ভারতের অবসাদ অধোনতির প্রবল স্রোতের গতিতে বাধাপ্রদান করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে আপন পায়ে আপনি খাঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনেক পরিমাণে ভারতের সাধন পথ পরিষ্কার এবং প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শিখজাতির মূল কাণ্ড স্বরূপ মহাপুরুষ নানকের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মই উপেয়।

কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা মানব জীবনের অপূর্ব্ব অলঙ্ঘনীয় বিধান। মানব স্বভাবতঃ কর্ম্ম-জালে বিজড়িত। জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যু মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ, মানব কর্ম্মসাধন লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কর্ম্ম সাধনার হাত হইতে কোন মানব এড়াইতে পারে না।

শ্রীভগবানের উক্তি :—

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বৈঃ প্রকৃতিজৈগু´ণৈঃ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই কোন অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না; প্রকৃতির গুণ-সমূহ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।

কর্ম্মই তো বন্ধন। কর্ম্ম হইতে নিস্তার লাভের নামই তো মুক্তি। যতক্ষণ দেহ, যতকাল জীবন, ততকাল কর্ম্ম করিতেই হইবে। মানুষ যতকাল এই ভাবের মানুষ থাকিবে, ততকাল তাহার কর্ম্মের ভোগ ভুগিতেই হইবে। নিজে না করিতে চাহিলে, প্রকৃতি ঘাড়ে ধরিয়া মানুষকে কর্ম্ম করাইয়া লয়।

কর্ম্মই ভবের ঘানি। সাধক রামপ্রসাদ কাতর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"ভবের ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত"। সাধনা দ্বারা যিনি কর্ম্মশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, কেবল তিনিই 'ভবের ঘানি'র পাক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ।

মানুষ যতকাল অজ্ঞান-মোহের আঁধারে আচ্ছন্ন থাকে, ততকাল সে অন্ধভাবে ভবের ঘানিতে জোড়া রহিয়া স্থূল সংসারে স্থূল কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত থাকে।

এইরূপ মূঢ় মানব জ্ঞানহীনভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে, জ্ঞান-সোপানে অধিরোহণ করে। তখনই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তখনই মানুষ যথার্থ মানুষের মত মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

যখন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, তখনই তাহার প্রাণকে আলোড়িত করিয়া জিজ্ঞাসা জন্মে—এখন কি করিব? এই যে মনুষ্যের মহৎ জীবন লাভ করিয়াছি, এ জীবনের সাধনা কি? এ জীবন লইয়া কি করিব?

এখন কথা এই যে, এ জিজ্ঞাসা জন্মে কেন? এ জিজ্ঞাসার মূল কোথা? অতৃপ্তি অশান্তি হইতে এই জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। মানব যতই শান্তির জন্য—সুখের জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, ততই কোথা হইতে দুঃখ অশান্তি আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। এই দশায় পড়িয়া সে কর্ম্মের পশ্চাতে ছুটিতে থাকে। কোন্ কর্ম্ম করিলে সুখ আসিবে—কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শান্তিলাভ হইবে—এই আশা-মরীচিকায় লুব্ধ হইয়া মূঢ় মানব সংসার-মরুভূমে ঘুরিতে থাকে। অবশেষে হতাশ প্রাণে হতাশ নেত্রে চাহিয়া দেখে সংসারের কোথাও সুখ নাই—শান্তি নাই। তবে সুখ কোথা—শান্তি কোন্ স্থানে?

এই অবস্থায় নির্ব্বেদ লাভ করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ মানব স্থির হইয়া উপবিষ্ট হয়। তখন সে স্থূল সংসার ছাড়িয়া—স্থূল সংসারের সকল ভুলিয়া আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ক্রমে বহির্দৃষ্টি ঘুরিয়া মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মেষিত হইতে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি বলে মানব দেখিতে পায়—সুখ বাহিরে নয়, স্বীয় অন্তরে—শান্তি সংসারে নাই—শান্তি আপনারই অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বাহিরকে ছাড়িয়া বাহ্য সংসারকে স্থূল ভোগকে ভুলিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশাধিকারেই প্রকৃত সুখ, তাহাতেই যথার্থ শান্তি। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

দুঃখযোনয় এব তে।

সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্ত্য সাধু এ কেম্পিস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিয়াছেন —Vanity—all are vanity—Vanity of vanities এই সকল অসার অনিত্য বস্তু বিশেষ ভাবে বর্জ্জন করিয়া একমাত্র সার সত্যস্বরূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আশ্রয় লাভেই পরম সুখ—মহাশান্তি।

কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা মনুষ্যজীবনের যেমন অনিবার্য্য পরিণতি—কর্ম্মতত্ত্বের এই চরমসীমা মনুষ্যত্ব অভিব্যক্তির শেষ ফল।

মানুষ স্বভাবতঃ কর্ম্মের অধীন। কিন্তু সে প্রকৃতির বশে অধীন হইয়া এমন কর্ম্ম করে কেন? কর্ম্ম করে মানুষ প্রধানতঃ দুই কারণে— এক আপনার জীবনকে বজায় রাখিবার জন্য, দ্বিতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিয়া, তাহাকে সুখ শান্তি ভোগ করাইবার জন্য। এই দুইটিই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বুঝিবার নিমিত্তই কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা—আর এই উদ্দেশ্য সাধনের নামই কর্ম্ম-সাধন।

'আমি কি করিব?' এই জিজ্ঞাসার নাম কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর বুঝাই—কর্ম্মতত্ত্ব অবগতি। এই জিজ্ঞাসার মূলে আবার জিজ্ঞাসা জন্মে আমি কি—আমার স্বরূপ কি? এ কথার উত্তরে বুঝা যায়—আমি অনুভূতি স্বরূপ। এই অনুভূতির স্থূলত দুই ভাব। ঐ দুই ভাবের নাম বেদন—এক অনুকূল-বেদন, অপর প্রতিকূল-বেদন। অনুকূল বেদনের নাম সুখ; প্রতিকূল বেদনের নাম দুঃখ। সুখপ্রাপ্তি আর দুঃখদূরীকরণ অনুভূতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জীবনকে রক্ষা করে।

সকল জীবনেরই উদ্দেশ্য—দুঃখদূরীকরণ ও সুখসম্ভোগ। দুঃখ বা সুখ সকল জীবের পক্ষে সমান নয়—মানুষের পক্ষেও নয়। মানবের প্রকৃতিভেদে সুখ দুঃখের ভেদ ঘটিয়া থাকে।

হিন্দু শাস্ত্র মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিন প্রকার সুখের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছে যথা :—স্বাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। স্বাত্ত্বিক সুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। এই সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥"

অভ্যাসবশতঃ যে সুখে পরমানন্দ লাভ হয় ও দুঃখের অন্ত হয় এবং যাহা অতি অনির্ব্বচনীয়, প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য ও আত্মজ্ঞান-জনিত প্রসাদস্বরূপ, সেই সুখ স্বাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই সুখই চরম উপেয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

বাহ্য উপভোগে—স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগে সে সুখলাভ ঘটে না। সে ভোগে প্রথমে সামান্য সুখ লাভ হয়; কিন্তু পরিণামে উহা বিষের স্বরূপ হইয়া উঠে। উহা রাজসিক সুখ। গীতায় সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।"

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যাহা অমৃততুল্য, কিন্তু পরিণামে বিষ তুল্য, সেই সুখ রাজসিক নামে অভিহিত।

আরও নিম্নস্তরের সুখ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥"

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর যে সুখ, তাহা তামস নামে কথিত।

মানব-প্রকৃতির বিভাগ অনুসারে, সুখের এই তিন প্রকার স্বরূপ পরম শ্রেষ্ঠ গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

এই তিন প্রকার সুখের মধ্যে সাত্ত্বিক সুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। এই সুখ হইতেই মহামুক্তি বা পরমানন্দ লাভ ঘটিয়া থাকে।

একমাত্র অধ্যাত্ম তত্ত্বের আশ্রয় হইতে এই সুখলাভ হইয়া থাকে। স্থূল ছাড়িয়া অতি সূক্ষ্মে প্রবেশের নামই আধ্যাত্মিক আশ্রয়। আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের দিকে যে গতি, তাহারই নাম ধর্ম্ম সাধনা। কারণ একমাত্র অধ্যাত্মই ধর্ম্মক্ষেত্র।

মানব মাত্রেরই পরিণাম গতি এই অধ্যাত্মের দিকে। ইহাই তাহার স্বাভাবিক গতি—প্রাকৃতিক পরিণতি। যখন এই স্বাভাবিক গতি ও প্রাকৃতিক পরিণতির পন্থা ছাড়িয়া মানব পথভ্রষ্ট হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের প্রকৃত সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এই তত্ত্ব যিনি সম্যক্ প্রকারে বিদিত আছেন, তিনিই সনাতন জগতে সাধু নামে অভিহিত হন এবং সর্ব্বদায় নির্ব্বিশেষে পূজা পাইয়া থাকেন। গুরুনানক এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি একটা অখণ্ড শিখ জাতির ধর্ম্ম প্রদর্শক গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

গুরু-নানকের জীবন কাহিনী, শিখ সম্প্রদায়ের মৌলিক মহাভাব। শিখ সম্প্রদায়কে বুঝিতে হইলে, তাহার ভাব গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার মূল তত্ত্ব গুরু নানকের জীবন কাহিনী অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

যখন সিন্ধুনদ-কূলবর্ত্তী পরম পবিত্র আদিম আর্য্যস্থান পঞ্জাব প্রদেশ পাতিত্যের দিকে অধোনত হইতেছিল, তখন যে মহাপুরুষ আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন, তিনি গুরু-নানক নামে বিখ্যাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তি-পন্থী নানক।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

হে ভারত! যে যে কালে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য ঘটে, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি।

ধর্ম্ম অর্থেই জীব ও জগতের উৎকর্ষ সাধন। উৎকর্ষ বা মঙ্গলই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ। তাহাই জীবের ও জগতের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম ভিন্ন জগতের ও জীবনের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। জগতের ও জীবনের মঙ্গলের জন্যই ভগবান্ তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের অধোনতি বা অমঙ্গলের জন্য কখনই নয়।

জগতের বা জীবের অমঙ্গল বা অধোনতি ঘটিলে অথবা ঘটিবার আশঙ্কা হইলে ভগবানের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠে। তখন ভগবান্ আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। ভগবানকেও আবার রূপ ধারণ করিয়া নামিয়া আসিতে হয়।

বিশেষতঃ ভারত ভূমি ধর্ম্ম ভূমি। ভারতই সর্ব্ববিধ শুভ ও সৎ ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র। এস্থলে ভারত ক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র। সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের বীজ এই ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হয়। এমন স্থলে ধর্ম্মের কোনরূপ গ্লানি কখনই ভগবানের প্রাণে সহ্য হইতে পারে না। এখানে কোন সৎ ধর্ম্মের কোনরূপ হানি হইলে ভগবানকে আসিতেই হয়।

সিন্ধুতীরবর্ত্তী পঞ্জাব প্রদেশ ভারতের এক শ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র স্থান। এস্থানে মহৎ ধর্ম্মের মহান মহীরুহ নিশ্চয়ই প্রকটিত হইবার কথা। তাহাতে কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ঘটিলে, ভগবৎ বিধানের একান্তই বিরুদ্ধ বিপরীত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

যৎকালে পরম পবিত্র সিন্ধুনদীকূলে ধর্ম্মগ্লানি সংঘটনের সম্ভাবনা হইল, তখনই ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ নানক অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া পরম পবিত্র অতি মহাধর্ম্মের মহাবীজ তথায় বপন করিলেন।

সেই মহাবীজই কালে উদ্গত ও বিকশিত হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ শিখ ধর্ম্মের বিশাল বিটপীতে পরিণত হইয়াছে। সেই পরম পবিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ফলেই, অতি প্রবল ও মহোন্নত শিখ জাতির অভ্যুদয় সম্ভবপর হইয়াছিল।

গুরু নানক আসিয়া যে ধর্ম্মবীজ পঞ্জাবের পবিত্র ক্ষেত্রে বপন করেন, তাহা পরম পবিত্র ভক্তি-ভাবাপন্ন।

নানক-প্রবর্ত্তিত ভক্তিভাব ধর্ম্মের অতি শ্রেষ্ঠস্তর। কথাটা একটু বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা প্রয়োজন।

ধর্ম্ম প্রধানত তিন শ্রেষ্ঠস্তরে বিভক্ত। যথা:—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই ত্রিবিধ স্তরের মধ্যে কর্ম্ম সর্ব্বনিম্নস্তর, জ্ঞান মধ্যস্তর ও ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা চরমস্তর। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উদ্ভব; জ্ঞান হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা চরমস্তর ভক্তিস্তরের পরিণতি ঘটিয়া থাকে।

ভগবানের সৃষ্টিকাণ্ডে অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিভূতি দর্শনে—তাঁহার লীলা-মাধুর্য্যের গূঢ় রসাস্বাদন ও তাহাতে পরমপ্রেম ভাবের উচ্ছ্বাস শ্রেষ্ঠ ভক্তিস্তরের প্রকটিত লক্ষণ। মহাপুরুষ নানক ভক্তিভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া তন্ময় বিহ্বলভাবে গাহিয়াছিলেন—

"গগনময় আন রবি চন্দ্র দীপক বোমে,
তারকা-মণ্ডল জনক মোতি।"

যিনি ভগবানের বিভূতিযোগে যুক্ত হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই মহাগীতি গাহিয়াছিলেন—যাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হইতে এইরূপ গীতোচ্ছ্বাস বিনির্গত হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় পরম ভগবদ্ভক্ত মহাজন সংসারে নিতান্তই দুর্ল্লভ। যখনই সমাজে পাপ তাপের প্রাবল্য উপস্থিত হয়, তখনই গুরু নানকের ন্যায় মহাপুরুষ আসিয়া পতিত অধোনত সমাজকে প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করেন।

নানক যে কেবল শিষ্য সমাজের উন্নতি উৎকর্ষ সাধন করেন এমন নহে, তাঁহার পবিত্র পন্থা ও মঙ্গলমার্গের দৃষ্টান্তে ভারতের বহু পতিত সমাজ উন্নতি ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নানকের সমকাল।

যখন মহাপুরুষ নানক পঞ্জাব প্রদেশকে পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, তখন ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময় লোদী বংশ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া উত্তর পশ্চিম ভারতে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিল।

তখন ভারতের অতি শোচনীয় অবস্থা। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি—সর্ব্বদিকে সর্ব্ববিষয়ে ভারত তখন তেজো-বীর্য্যবিহীন হইয়া অতি মুহ্যমান দশায় নিপতিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে তদুপরি বৈদেশিক রাজ-শাসন প্রভাবে ধর্ম্মভাব ও নীতিভাব বিশেষরূপে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেদ-বিধি-নির্দ্ধারিত সনাতন ধর্ম্ম অনেকাংশে ক্ষুন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব মহাভাব ভুলিয়া অনেক হিন্দুসন্তান নানারূপ উপধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। সেই সকল উপধর্ম্ম হইতে বিকট কুসংস্কার ও কদাচারসমূহ সমাজে প্রবলবেগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। বিশুদ্ধ সৎ ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও প্রচারক ব্রাহ্মণগণ বিবিধ বিঘ্নবাধায় স্বস্ব ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মপ্রচারে অসমর্থ হইলেন।

সমাজকে শাসন করিবার ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর পক্ষে রাজা ও রাজদণ্ডই প্রধান উপায়স্বরূপ। কিন্তু তৎকালে হিন্দুরাজা ও তদীয় রাজশক্তি নিতান্ত হানবীর্য্য হইয়াছিল; কাজেই সনাতন ধর্ম্ম ও সনাতন-বিধি নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত সমাজ পরিম্লান হইয়া পড়িল। হিন্দুধর্ম্মের অপভ্রংশ ও বৌদ্ধধর্ম্মের পতিত সংস্কার ধরিয়া, নানারূপ অপধর্ম্ম, কদাচারপূর্ণ আচার সমাজ-দেহে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

ধর্ম্মের স্থূল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা-নিকেতন বলিয়া যে ভারতবর্ষ জগতে বিখ্যাত ও অতুলনীয় ছিল, তাহাই অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের পৈশাচিক লীলাভূমি স্বরূপে পরিণত হইল।

এইরূপ অত্যাচার অনাচারের উপর আবার মুসলমান আসিয়া যখন ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভারতের সনাতন ধর্ম্মে—আচার অনুষ্ঠানে অতি প্রচণ্ড আঘাত আপতিত হইতে লাগিল। মুসলমান রাজা যদিও আসিয়া এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া এদেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রথমতঃ বদ্ধপরিকর হয় নাই, তথাপি বহু প্রলোভনে ও পীড়নের জাল প্রসারিত করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই প্রলোভন ও পীড়নের ফলে বহু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সন্তান ইসলাম ধর্ম্ম ও ইসলামের রীতি নীতি অবলম্বন করিতে লাগিল। স্বয়ং মহাপুরুষ গুরু নানকও মুসলমানের অত্যাচার হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি সুদূর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অপেক্ষা মুসলমান প্রধান দিল্লী লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে অবশ্য সমধিক পরিমাণে প্রবল হইয়াছিল। যে জাতি যখন রাজা হয়, তখনই সেই জাতির ধর্ম্ম যে প্রবল হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। সেইজন্য আবার জাতীয় ধর্ম্মের বিপ্লব অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ লোদী বংশ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচার ও তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ উপায়-কৌশল ও অত্যাচার-আড়ম্বর অবলম্বন করিয়াছিল, তেমন বোধ হয় মোগল রাজত্বকালে এক আউরঙ্গজীবের শাসন-কাল ব্যতীত আর কখনই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত যতটুকু নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, লোদীবংশের শাসন সময়েই মুসলমান ধর্ম্ম

এদেশে ও এ দেশীয়দের মধ্যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বদ্ধমূল হইবার পক্ষে প্রবল চেষ্টা ও প্রচণ্ড আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। লোদীবংশীয় শাসনকর্ত্তারা প্রায় অনেকেই ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। বিচারহীন ধর্ম্ম বিশ্বাস ধর্ম্ম সাধনও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ করিয়া থাকে।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার স্বীয় শিষ্যবর্গ যেরূপ জ্ঞানী ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সেরূপ জ্ঞানী বা বিরুদ্ধধর্ম্মগত সহৃদয় ছিলেন না।

বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া দেখিলে বেশ জানা যায় যে, ইসলাম ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অতি বিষদ পরম পবিত্র ধর্ম্ম। যথার্থ—একেশ্বরবাদ (theism) এক ইসলাম ধর্ম্মে যেরূপ ভাবে প্রখ্যাত প্রকটিত হইয়াছে, এমন বোধ হয় জগতে আর কোন ধর্ম্মেই হয় নাই। ইসলাম ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি কোরাণ সরিফ অতি গভীর নিনাদে একমাত্র অনাবিল একশ্বর বাদেরই ঘোষণা করিয়াছেন। 'লা ইলা-ইল ইল্লা মহম্মদ রসুল ইল্লা' কোরাণ-সরিফের এই মহাবচন একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে এক অতি বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বচন। ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে জগতের সভ্য সমাজে যত সূত্র কথিত বা প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহাবচনের তুল্য অতি অল্প সূত্রই পরিশ্রুত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সৎনীতিপূর্ণ প্রবচন সমূহ পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশে বিবেচনা করে যে, মহম্মদ ভীষণ অত্যাচার ও শক্তি-পরিচালনা করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা যে নিতান্তই ভ্রম-সঙ্কুল ধারণা, তাহা যাঁহারা ইসলাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব ও ইসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন।

অবতার বা মহাপুরুষগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া

যেমন অধর্ম্মের বিনাশ সাধন করেন, তেমনি সাধুপীড়ক সৎধর্ম্ম-বিনাশক অসাধু দুষ্টগণেরও দমন করিয়া থাকেন। হজরত মহম্মদ নাস্তিক দুষ্টগণের ধ্বংস সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা কে বলিবে ?

এখনও এদেশে অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, মহম্মদ এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে ধর্ম্ম গ্রন্থ ধারণ করিয়া অতি ভীষণ প্রচণ্ড অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দুষ্ট ধর্ম্মহীন পাষণ্ডগণের দলন যদি অধর্ম্ম অত্যাচার হয়, তবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণকেও ঘোর অত্যাচারী বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়।

বাস্তবিক হজরত মহম্মদ কখনই অত্যাচারী ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধর্ম্মহীন পাষণ্ডদিগের দলন করিয়াছিলেন, হজরত মহম্মদ সেইরূপ ধর্ম্মহীন দুষ্ট নাস্তিকগণকে দমন করিয়া বিশুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী বহু শক্তিমাণ ব্যক্তি মন্দ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভারতের বহু মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

লোদীবংশ ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইরূপ নিরীহ প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। তজ্জন্য লোদীবংশের রাজত্বকালে এদেশে বিশেষরূপে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবে বহু অপধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিয়া পঞ্চনদ-কূলবর্ত্তী প্রদেশ বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিহীন হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে সাধু সজ্জনগণ কাতর হৃদয়ে এক প্রাণে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

এমন অবস্থায় ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ কখনই স্থির থাকিতে পারেন না।

সাধু ভক্তের করুণ ক্রন্দন তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তাঁহারই কৃপায় তৎকালে পতিত সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিল। ধর্ম্মের অবতার-স্বরূপ গুরু-নানক আবির্ভূত হইলেন।

পঞ্চনদ প্রদেশের অধর্ম্ম অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, সৎ-ধর্ম্ম-স্বরূপ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের আলোক প্রকাশ করিয়া গুরু-নানক তাহার উদ্ধার সাধন করেন। ভগবানের ইহাই এক অপূর্ব্ব বিধান যে, যখনই কোন সমাজ অধর্ম্মের প্রাবল্যে অধোনতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই ভগবানের আসন বিচলিত হয়। তিনি স্বয়ং অবতাররূপে বা মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সৎধর্ম্মের শুভ পন্থা প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মই ভগবানের স্বরূপ। উন্নতি মঙ্গল ধর্ম্মেরই প্রকটিত মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভক্তি-সাধক-নানক।

ভগবানের বিভূতিযোগে সংযোগ-নিবন্ধন হৃদয়ের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস ভক্তির প্রকট লক্ষণ। এই ভাব জাগরূক হইলে ভগবানের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা সমন্বিত পূজা উপাসনায় উপজয় হইয়া থাকে। প্রাণের প্রীতি হৃদয়ের ভক্তিভাব লইয়া যে উপাসক ভগবানের পূজা করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত—তিনিই যথার্থ—ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রেষ্ঠ যোগী। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

অর্থাৎ আমার প্রতি মনকে একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার ভজনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

এইরূপ পরম ভক্তি ভাবের উদয় হইলে ভাগ্যবান্ ভক্ত জনের যে যে লক্ষণ প্রকটিত হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন :—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ সে মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ, সর্ব্বভূতে বিদ্বেষ বিহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও কৃপাবান মমত্বহীন,

নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, সংযতচিত্ত, আমার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মন এবং বুদ্ধি সমর্পণকারী এমন যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে বিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যে ভক্ত সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন, চিন্তা-বিহীন এবং সঙ্কল্প-বিকল্প-বিহীন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হন না, বিরক্তও হন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং যিনি পাপ পুণ্য উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তজনই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে বিকারবিহীন, আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাববিশিষ্ট, মৌনী, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানহান, স্থিরচিত্ত এমন যে ভক্ত তিনি আমার প্রিয়। যাঁহারা উক্তরূপ এই অমৃতময় ধর্ম্মের আচরণ করেন, শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার পরম প্রিয়।

ভক্তি ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন এবং পরমেশ্বরে সংযত হইলেই তাহার মোচন হয়। সচ্চিদাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগই যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির পথ; তদ্ভিন্ন মঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।" ভগবান্ নিজ বাক্যে সাধুসঙ্গ ও ভক্তিভাবের এক বিশিষ্ট লক্ষণরূপে বলিয়াছেন—সাধু সমাজে হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, আমার বীর্য্যপ্রকাশক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎসেবনেই আশু আমাতে অপবর্গ কর্ম্মস্বরূপ ভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে। তৎপরে পুরুষ ক্রমশঃ আমার সৃষ্ট্যাদি ভাবনা করিয়া থাকে। 'যাহাদের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব

হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকে সেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। জঠরস্থ অগ্নি যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও নিজ শরীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে।'

হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বহু অমূল্য প্রসঙ্গ পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রসঙ্গের ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। প্রকৃত ভক্ত মহাজন যিনি, তিনি অন্ত সামগ্রী তো দূরের কথা, মুক্তিকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তন্ময় ভক্ত, ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া জগতে যে মধুর রস আস্বাদন করেন—অদ্ভুত সৃষ্টিলীলায় যে অমৃত উপভোগ করেন, তাহা জগতে জীবনে নিতান্তই দুর্ল্লভ। সেই পরম ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সংসারের সর্ব্বপ্রকার পাপ তাপকে পদদলিত করিয়া, আত্মহারা ও আত্মানন্দে সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকেন। সে আনন্দের কি আর তুলনা আছে? সেই অপূর্ব্ব আনন্দের স্বরূপতত্ত্ব যে কি, তাহা কেবল সেই ভাগ্যবান ভক্ত মহাজন উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এইভাবে বিভোর হইয়াই ভক্তজন অন্তরের অন্তস্তল হইতে গাহিয়াছেন :—

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত পৃথিবী মাঝার।
প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি
ক্ষিপ্ত যে প্রকার।

কভু বা হাস্য বদন
কভু বা করে রোদন,
কখন মঙ্গল মন বাক্য ব্যবহার।

কেবলমাত্র এই ভক্তিভাবেই ভক্তজন শ্মশানস্বরূপ সংসারে মধুময় অমৃতপূর্ণ গোলোকধামের সন্দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। কেবল তখনই তাঁহার পক্ষে সবই মধুময় হইয়া উঠে। ভক্ত তখন প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠেন :—

"মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ" ॥

তখন সামান্য তৃণ গুল্ম হইতে—তুচ্ছ কীট পতঙ্গ হইতে—জীবলোক —মানবলোক পর্য্যন্ত সবই সেই ভক্তের একমাত্র প্রেমডোরে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অপূর্ব্ব যে মহাভাব—দিব্যোন্মাদের ভাব।

গুরু নানক এই মহাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

গগনের তলে রবি চন্দ্র দীপক জ্যোতি।
তারকামণ্ডল জনক মোতি রে।

কি অপূর্ব্ব হৃদয়ের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস! গুরু-নানকের ধর্ম্মপথ এমন মহাভাবের মহোচ্ছ্বাস বহুস্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল মহাভাবের গুরুত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, গুরু নানকের পদতলে স্বতঃই হৃদয়বান মানবের মস্তক বিলুণ্ঠিত হয়।

নানক অতি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি কোন দার্শনিক সূত্র সন্ধানে অথবা বৈদান্তিক যুক্তি পন্থা অবলম্বনে একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। তিনি সহজ স্বাভাবিক যুক্তি বিচারের বলে—সহজ সরল ভাবে ও ভাষায় একেশ্বরবাদ ও ভক্তিভাবের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সেইরূপ সহজ সরল ভাবেই সরলপ্রাণ সাধারণ জনগণ মধ্যে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম—এই যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ—এই যে সহজ সরল প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাস—ইহাই সাধারণ মানবের ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ভক্তিধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠ লোক-গুরুগণ প্রচার করিয়া পতিত মানব-সমাজের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

বাস্তবিক দার্শনিক ধর্ম্ম—যাহা কেবল শুষ্ক জ্ঞান বিচার লইয়া ব্যতিব্যস্ত, যাহার পরিণতি সন্দিগ্ধ বা অজ্ঞেয়, তাহার মূল্য মানব হৃদয়ের পক্ষে কিছুই নয় বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা, হৃদয়ের ভাবই ধর্ম্ম প্রসারণের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র। জনসাধারণ হৃদয়ের ভাব লইয়াই ধর্ম্মকে ধারণ, পোষণ ও প্রসারণ করিয়া থাকে। জগতের অতি অল্প লোকই বুদ্ধি-বিচারের সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া ধর্ম্মের নির্দ্ধারণ ও সংপোষণ করিয়া থাকে।

ধর্ম্মই মানবের জীবন—ধর্ম্মই মানব জীবনের সার সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মহীন মানব জীবন শুষ্ক মরুভূমি। যে মানব-জীবনে ধর্ম্মের বীজ পতিত হয় নাই, সে মানব-জীবনে কোনরূপ সৎ ও শুভভাব প্রস্ফুরিত হইতে পারে না। শুষ্ক নীরস মরুভূমে যেমন ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতার উদ্ভব অসম্ভব, সেইরূপ ধর্ম্মহীন শুষ্ক মানব-জীবনে দয়া, দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা, শান্তি আদি সৎভাব কখনই বিকশিত হইতে পারে না। যে মানব-জীবনে কোনরূপ সৎ শুভভাব প্রস্ফুরিত হয় না, তাহার অস্তিত্ব জগতের পক্ষে একটা বিষম বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বিশ্বপতি বিধাতা জগতের মঙ্গলের জন্যই অবশ্য উহার সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা যিনি আত্মকাম, যিনি অসীম অনন্ত, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনি আপনার কোন্ সাধ চরিতার্থ করিবার জন্য সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন? অনেকে সৃষ্টি ব্যাপারকে ভগবানের লীলা-চাতুর্য্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। যদিও লীলা হয়, তবুও

তাহাতে বাসনার বিলাস বিন্দুমাত্রও নাই। উহা পরমানন্দ ভাবের একটা তরঙ্গ উচ্ছ্বাস-স্বরূপ। সন্দেহ-বাদী নাস্তিকশ্রেণী অবশ্য ভগবানের লীলা-কাণ্ডে স্বার্থ-বিজড়িত বাসনার আরোপ করিয়া, সৃষ্টি-কাণ্ডকে হেয় ভাবাপন্ন করিয়া থাকে। তাহারা কিন্তু ভগবানের আনন্দভাবের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াই সেইরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়া থাকে।

যাঁহারা যথার্থ সাধু, প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই ভগবৎ-লীলার মাধুর্য্য রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তাঁহারা ভগবৎ-লীলা-অঙ্গের কোথাও কাম-গন্ধ অনুভব করেন না। কারণ, তাঁহারা নিজেরাই কাম-গন্ধ-বিবর্জ্জিত। ভগবানের পরম ভক্ত প্রিয়জন স্বতঃই কামনা বাসনাদি ভাবের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে যেমন কাম-বাসনাদির লেশমাত্রও দেখিতে পান না, তেমনি ভগবানের লীলা-ব্যাপারেও কাম-ভাব আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্রই কি আপনার মধ্যে—কি অধ্যাত্ম জগতে—কি বাহ্য জড় জগতে সর্ব্বত্রই এক অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধুময় তরঙ্গ দেখিয়া বিভোর ও স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।

এমন ভাবের অধিকার লাভ অবশ্য বহু ভাগ্য-সাপেক্ষ। বহু তপস্যায়, জন্মজন্মের সাধনায় মানব যখন ভক্তিভাবের ভাগ্য লাভ করে, কেবল তখনই সে লীলাময়ের লীলা-কাণ্ডে কেবল পরমানন্দের স্বরূপ লক্ষণ প্রকটিত ভাবে সন্দর্শন করিতে থাকে।

মানবের বহু ভাগ্যফলে ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টি লাভ করে। তাহাতে ভক্তিপ্রেমের সর্ব্ববিধ সৎ ও শুভ ভাব-সমূহ মানব-হৃদয়ে বিকশিত হইতে থাকে। ক্রমে এই সকল ভাব বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়া এক মহাভাব মধুরভাবে পরিণত হয়। এই মধুরভাব মহাত্ম্যবই মানব-

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ভক্তগণ ইহার নানারূপ বাহ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নানক সেই মহাভাবে বিভূষিত হইয়া, জগতে তাহার অপূর্ব্ব লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে বাহুল্যরূপে সে কথা বলিবার সময় নহে, পরে তাহা বর্ণিত হইবে। এক্ষণে নানকের প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের বর্ণনাকালে, প্রসঙ্গ ও মূল ধর্ম্মের স্বরূপ এবং ধর্ম্মের ভ ব একটু বিশদরূপে আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়।

বাস্তবিক ধর্ম্ম মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক ভাব। মানব-চিত্তের অস্বাভাবিক দশা উপস্থিত না হইলে, কোন মানবই ইহাকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে না। নিতান্ত অজ্ঞ মূর্খ হইতে চিন্তাশীল পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই কোন না কোন আকারে—কোন না কোন ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে।

স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে গতি নিয়তি ধর্ম্মের বিশিষ্ট ভাব লক্ষণ। অধ্যাত্ম মানব-জীবনের পক্ষে অতি সূক্ষ্ম সামগ্রী। যাহাতে সেই দিকে গতি ঘটে, ধর্ম্ম তাহারই পন্থা প্রদর্শন করে। মানব-হৃদয়ে দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম আদি যে সকল মহৎ ভাব আছে, তাহা ধর্ম্মপথেরই সঙ্গিস্বরূপ। মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ঐসকল মহৎ বৃত্তিতে বিভূষিত। উহাদের অনুশীলনে ধর্ম্মেরই আচরণ অনুষ্ঠান-ঘটিয়া থাকে। তাই জগৎস্রষ্টা জগৎপালক পরমেশ্বর মানব-হৃদয়ে স্বভাবতঃই ঐসকল সৎগুণের সমাবেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সাধারণ মানবগণ হৃদয়ের ভাব হইতেই ধর্ম্মকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকে। তাই স্রষ্টা ধর্ম্মের সাধারণ মৌখিক বীজগুলি সাধারণ মানব-জীবনেই প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মের ঐসকল সাধারণ ভাবগুলি সকল মানবই স্বভাবতঃ ধারণ ও পোষণ

করিয়া থাকে। জগতের ধর্ম্মনেতা ধর্ম্মপ্রচারকগণ সাধারণতঃ মানব হৃদয়ের এই সকল ভাব ধরিয়াই ধর্ম্ম-রাজ্য সংপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।

গুরু নানকও ভক্তিভাবকে ধরিয়াই অতি মঙ্গলময় মহৎ ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রায় সকলেই মানবের স্বাভাবিক সহজভাব ধরিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। মহম্মদ, খ্রীষ্ট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপালকগণ সকলেই স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা। গুরু নানকও এই স্বাভাবিক ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন।

ভক্তি ধর্ম্মই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানবহৃদয় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তি বিচারের পন্থা অনুসরণ করে না। অথচ এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, সকল দার্শনিক বিচার বিতণ্ডা যুক্তি তর্ককে দলিত করিয়া, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলেই মানব হৃদয়ের উপর আধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার সত্যতা সারবত্তা সম্বন্ধে এই তো যথেষ্ট প্রমাণ। জগতের যত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সকলই একমাত্র এই ভক্তি-ভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মে আর ভারতীয় দুই একটি দার্শনিক ধর্ম্মে ভক্তিভাবের নিদর্শন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য। একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মই ভক্তিহীন ধর্ম্মের মধ্যে প্রবল। কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া বুঝিলে বর্ত্তমান আকারের বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারেই ভক্তিহীন নহে। ঈশ্বর পূজা, ঈশ্বর উপাসনা না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধ পূজার প্রথা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মে পূজা উপাসনার প্রথা প্রচলিত, তাহাকে কখনই একেবারে সম্পূর্ণ ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিত বলা যায় না।

ফলতঃ ভক্তিকে ছাড়িয়া কোন সৎ বা উন্নতিশীল ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না। এমন কি অতি হীন অসভ্য জাতির কুসংস্কারপূর্ণ বর্ব্বরসেব্য ধর্ম্মও নিতান্ত ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিত নহে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি যখন বৃক্ষ প্রস্তরাদির উপাসনায় হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করে, তখন তাহাতেও ভক্তির ভাব সূক্ষ্ম আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাহাতে ভীতি (awe) ভাব আরোপ করে। আধুনিক প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান (Psychology) সকলই স্থূল জড়ভাবের বিকাশ বলিয়া নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। মানবের সকল শ্রেষ্ঠ ভাবই মস্তিষ্ক আদি যান্ত্রিক শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ বা অভিব্যক্তি বলিতে উহা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। উহাতে মানব-আত্মা অথবা মানবের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব (spiritual part) বলিয়া কোন সামগ্রীর স্থান বড় নাই বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান মানবের ভক্তি-ভাবকে, মানব-প্রকৃতি সহজ সাধারণ ভাব ও ভয় বিহ্বলতা (awe & admiration) হইতে সংজাত বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

যে যাহাই বলুক, যাহারা মানব-আত্মার অস্তিত্ব ও মানবের অধ্যাত্ম-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগকে ভক্তির স্বাভাবিক সত্তা ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশতত্ত্ব মানিতেই হইবে। যাহারা তাহা মানে না—যাহারা কেবল জড় বিজ্ঞানের দিক দিয়া মানবের আত্ম-তত্ত্ব—মানবের সকল মহৎ ভাবের সমাধান করিতে চেষ্টা করে, তাহারা নাস্তিক। এই শ্রেণীর নাস্তিকের সহিত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিচার নিতান্তই নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন।

মানবের আত্মা—মানবের অধ্যাত্ম শক্তি স্বতঃই স্বীকার্য্য। তাহা স্বীকার করিলে ভক্তিভাবকে কিছুতেই উড়াইতে পারা যায় না।

ভক্তিতত্ত্ব মানব-হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। উহা সপ্রমাণ—যৌক্তিক প্রমাণের অতীত অতি বিরাট তত্ত্ব। বাহ্য-জগতে সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ, অধ্যাত্ম-জগতে ভক্তিভাবও তেমনি স্বপ্রকাশ। উহা স্বীয় তেজে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকে।

ভক্তিবিহীন যে ধর্ম্ম, তাহার গুরুত্ব গভীরত্ব নিতান্তই অসার অলীক। জগতে তেমন নাস্তিক-ভাবাপন্ন ধর্ম্ম কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। বর্ত্তমান ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত কোমৎ এইরূপ ভগবৎ-ভক্তি ধর্ম্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় যে কিরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এখনকার শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে অজ্ঞাত নহে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-মানবীয় প্রেম-ধর্ম্ম (Religion of humanity) অবশ্য মানবের সমাজ ও নীতি হিসাবে এক অতি অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে তাহার অসারতা ও নিষ্ফলতা এখন অনেকেই বেশ বুঝিয়াছে। ভক্তিহীন ধর্ম্ম যেমন অতি হেয়, ধর্ম্মহীন নীতিও তেমনি অতি হেয়।

ভক্তি সম্বন্ধে এখানে এতো কথা বলিবার কারণ এই যে, নানকের জীবন যেমন ভক্তিস্তরে সংগঠিত, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বও তেমনি ভক্তিভাবে ভরপুর। নানক নিজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিভাবের বিশেষ বিশেষ স্তরগত ভাব অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়া, অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণ মানব-কুলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেই ধর্ম্ম-বিশ্লেষণ ও ভক্তিভাবের বিকাশ-নির্দ্দেশ যথার্থই ধর্ম্মজগতে এক অতি অপূর্ব্ব সুদুর্লভ ব্যাপার। পাঠক, বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার মহাবচন ও দোঁহাসমূহ অধ্যয়ন করিলেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমরা মূলেই সেই কথার উল্লেখ করিলাম।

এখন একটা জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে ভক্তি কেন? ভক্তির প্রয়োজন কি? ভক্তি বলিয়া যে জিনিসটার এত আদর, তাহার অভাব হইলে মানুষের হানি কি—মানব সমাজের ক্ষতিই বা কি? একথাগুলি আলোচনা করিয়া এখানে একটু বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। কেননা—ভক্তির অভাব ঘটিলে মানব প্রকৃতই পশুতে পরিণত হইয়া পড়ে, তদভাবে মানব সমাজ নিতান্ত হীন দশায় নিপতিত হয়। যাহা লইয়া মানব যথার্থ মানব—যাহার অনুশীলনে, সাধনে মাটির তুচ্ছ মানব দেবত্ব লাভ করে, তাহার অভাব ঘটিলে মানব ও মানব-সমাজ যে সত্যই অতীব শোচনীয় দশায় নিপতিত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভক্তি সম্বন্ধে—এসকল কথা বুঝিতে হইলে, অগ্রে ভক্তির স্বরূপতত্ত্ব বুঝিয়া লইতে হয়। তবেই মানব-জীবনে ভক্তির আবশ্যকতা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

ভক্তি সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। শাণ্ডিল্য ঋষি নিজ সূত্রে ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

সাঁশ্বুরক্তি।

অর্থাৎ ভগবানে একান্ত অনুরাগের নামই ভক্তি। গীতা, ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থেও এইরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। গুরু নানকও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভক্তিতত্ত্বের এইরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

যাহা হউক অনুরাগের অত্যন্ত ঘনীভূত ভাবই ভক্তির যথার্থ-স্বরূপ। অনুরাগ প্রেমেরই একটা বিশিষ্ট ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রেম-ভাবই প্রকৃতপক্ষে জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। এই ভাব হইতেই জগতের রক্ষণ ও পালন ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে। তুচ্ছ কীট

হইতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একমাত্র এই প্রেমেরই আধিপত্য প্রভাব অতীব প্রবল।

এক প্রেমভাবই যথার্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। কারণ, এই ভাব হইতেই জগতের রক্ষণ পালন ঘটিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে এই ভাবকেই প্রকারান্তরে বিষ্ণুর বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভাব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমেরই পরিপক্ক অবস্থা ভক্তি।

এই ভাব অনুরাগের নামান্তর বা ভাবান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন প্রেমভাব সম্মান শ্রদ্ধাদি শ্রেষ্ঠ বৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ পাত্রে সমর্পিত হয়, তখনই উহা ভক্তি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। তখনই গুরুজনে সমর্পিত সম্মান-বিজড়িত শ্রদ্ধা ভক্তিরূপ ধারণ করিয়া থাকে। উহা যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ ভগবানে আবিষ্ট হয়, তখনই মহাভক্তিরূপে পরিণত হয়।

প্রেমভাব পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট হইয়া ভগবদ্ভক্তি ভাব ধারণ করিলে, উহা পূর্ণত্ব লাভ করে। নানক আদি শিখগুরুগণ গ্রন্থকারের এই মহাভক্তিতত্ত্ব সুন্দররূপে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বুঝাইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। নানক-জীবন পরম ভক্তিময় শ্রেষ্ঠ জীবন। গুরু নানক, নিজ জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্তে ও বহু উপদেশে সেই পরম ভক্তিতত্ত্ব প্রদান করিয়া পতিত অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবকুলকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বংশকথা—জন্মস্থান।

পঞ্চনদ-তীরবর্ত্তী প্রদেশ প্রসিদ্ধ পঞ্জাব নামে বিখ্যাত। এই স্থান ভারতে যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনি পরম পবিত্র বলিয়া পরিপূজিত। শ্রেষ্ঠ বর্ষ ভারতবর্ষের এই মহাস্থানেই আর্য্যঋষিগণ প্রথম বৈদিক আশ্রম স্থাপন করেন। প্রথম সাম, ঋক আদি বৈদিক গানে তাঁহারা এই স্থানকেই পরম পবিত্র করিয়াছিলেন।

এই পঞ্জাব প্রদেশই ভারতবর্ষের সিংহদ্বারস্বরূপ। ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-ধর্ম্ম সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ ভাব ও নীতি এই পবিত্রক্ষেত্রেই প্রথম বিকশিত হয়। বৈদিক যুগের তত্ত্বজ্ঞান, উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা, বৈদান্তিক ব্রহ্মবিজ্ঞান, সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব প্রভৃতি আর্য্যগণের সকল শ্রেষ্ঠ তত্ত্বেরই আদিম লীলাক্ষেত্র এই পঞ্চনদ-তীরবর্ত্তী প্রদেশ।

ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য এইখানেই সমুদিত হয়, আবার এইখানেই সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়া ভারত-গগনকে নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রচণ্ড শৌর্য্য-বীর্য্য এইখানেই সমুদিত হইয়া আবার এইখানেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশ যথার্থ ই ভারতের অতীত স্মৃতি-গৌরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ক্ষেত্র। পঞ্জাবের সিংহদ্বার যেমন আর্য্য-বংশধরগণের রক্ষণাশ্রয়, তেমনি ঐ দ্বারই বৈদেশিক বৈরিবর্গের প্রবেশ-পন্থা স্বরূপ হইয়াছে। শক, হূণ, যবন হইতে শবর, পারসাক, গ্রীক, মোগল, পাঠান আদি সকল বৈদেশিক এই দ্বার দিয়াই ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

পঞ্জাব প্রদেশ ভারতের অতীত স্মৃতি গৌরবের নিদর্শন, ভারতের অধঃপতন বিড়ম্বনার এ বিষক্ষেত্র স্বরূপ। পঞ্জাব প্রসঙ্গে কবির গাথা প্রাণে উদ্ভাসিত হইয়া যথার্থই হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে।

বঙ্গের কবিবর গোবিন্দচন্দ্র প্রাণের আবেগে প্রাণের ভাষায় যমুনা লহরী তুলে গাহিয়াছেন :—

"তব জল কল্লোল সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও।
স্মরণে আসি মরমে পরশে কথা
ভূত সে ভারত যেদিন ও॥

পঞ্জাব প্রদেশের প্রসঙ্গ স্মৃতিপথে উদিত হইলে, এমন কোন্ মূঢ় ভারতবাসী আছে, যাহার প্রাণ না আবেগভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে?

পঞ্জাবই ভারতের শীর্ষস্থান—ভারত রাজরাজেশ্বরীর মুকুটমণি। এই ক্ষেত্রে বহু যুগে যুগে বহু বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, ভারতভূমিকে বিভূষিত করিয়াছেন। কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি তত্ত্বজ্ঞানে, কি বীর্য্যে, কি শৌর্য্যে এমন স্থান জগতে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহু মহাপুরুষের ন্যায়, গুরু নানক এই পঞ্জাব প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া, অজ্ঞান আঁধারে আচ্ছন্ন মানব সমাজের উদ্ধার সাধন করেন—পতিত মানবগণকে সৎ শুভ ভক্তিধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিয়াছেন।

গুরু নানক যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম তিলওয়ান্দি। উহা লাহোরের অন্তর্বর্ত্তী ভাটি নামক প্রদেশের অন্তর্গত। তিলওয়ান্দি অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের অনতিদূরে রাভী নাম্নী স্রোতস্বিনী কুলকুল গতিতে প্রবাহিতা।

তিলওয়ান্দি গ্রামস্থ অধিবাসিবর্গ অধিকাংশই শান্ত ও সাধুভাবাপন্ন। তাহারা সতত ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মভাব লইয়া থাকিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও কৃষি ও সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে গো মহিষাদি পশু পালনও তাহাদের জীবিকার এক প্রধান অঙ্গ।

এইরূপ যৎসামান্য কৃষি ও ব্যবসায়াদি দ্বারা তাহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। শান্তি ও সন্তোষ আদি কৃষিজীবনের যাহা কিছু সার সম্পদ, তাহাতেই তাহারা পরম পরিতুষ্ট। ফলতঃ সাধুপ্রকৃতি ও ধর্ম্মভাবই তাহাদের জীবনের প্রধানতম অবলম্বন।

তিলওয়ান্দি গ্রাম বহু প্রাকৃতিক শোভায় পরিশোভিত। শস্যক্ষেত্র-সমূহ গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়া, ঋতু কাল অনুসারে যে শস্য সম্পদ উৎপাদন করে, তাহাতে অধিবাসিবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হইয়া, অনেক সময় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। অভাব অনাটনে তিলওয়ান্দি গ্রামের অধিবাসিগণের চিত্ত কখনই ম্লান বা পরিশুষ্ক হইতে দেখা যায় না। একমাত্র সাধুভাব ও ধর্ম্মসেবাই তাহার প্রধান কারণ।

বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য-বংশধরগণ জানে, যে ধর্ম্মভাব জীবনে আলোচিত ও অনুশীলিত হইলে শান্তি, সন্তোষ আদি মানব জীবনের সার সম্পদ কখনই পরিভ্রষ্ট হয় না। আর্য্য-সন্তান জানে এবং ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র যে, ধর্ম্ম সাধনের জন্যই মানবের জীবন। ধর্ম্মহীন জীবন, মানুষের পক্ষে যথার্থই বিষকণ্টক—অতীব দুর্ব্বিসহ। ধর্ম্মরক্ষণ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্যই যেন ভগবান্ এই ভারত ভূমিকে পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং আর্য্য সন্তানগণ যেন ভগবানের সেই মহৎ সাধু উদ্দেশ্য সাধন-জন্যই সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাই একটু চিন্তা

ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলেই অতি বিশদরূপে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের এত সুন্দর ভাব, মনোহর মূর্ত্তি জগতের আর কোন মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম-সংস্থাপক, ধর্ম্ম-সংরক্ষক মহা বিভূতিশালী মহাপুরুষ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবির্ভূত হইয়াছেন, এত আর কোন বর্ষেই নহে। বাস্তবিক ভারতবর্ষই সৎ ও শুভধর্ম্মের আদর্শ স্থল পরম পুণ্যময় মহাক্ষেত্র। উত্তরে হিমালয় প্রদেশের ক্রোড়দেশ হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম প্রান্তে পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বে চট্টল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই বহু শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মের বহু ভাব নানা মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়াছে।

এই সকল বিবিধ ধর্ম্মের সংস্থাপক মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া, ভারতের সর্ব্বস্থলকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গুরু-নানক একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। ইনি প্রকটিত হইয়া, পঞ্জাবকে অভ্যুদয় কল্যাণের পরম শুভপন্থা প্রদর্শন করেন। যে মঙ্গলময় মহাবীজ তিলওয়ান্দি গ্রামে অঙ্কুরিত হইয়া পঞ্জাববাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করেন, সেই মহাপুরুষ গুরু-নানক ঐ গ্রামের এক শ্রেষ্ঠ পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

তিলওয়ান্দি গ্রামের সাধারণ অধিবাসিবর্গ যেমন শিষ্ট ও শান্ত ছিল, নানকের পিতৃ-মাতৃকুলও তেমনি পবিত্র ও প্রশান্ত ভাবাপন্ন ছিলেন। গুরু-নানকের পিতা ও মাতা উভয়ে অতি সৎ ও পবিত্র ভাবাপন্ন ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। যদিও নানকের পিতা, জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত বিষয়ী লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনই নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলিয়া কলঙ্ক-ক্লিষ্ট হন নাই। নিজ পরিবারবর্গের ও প্রতিবেশী বা গ্রামবাসীর প্রতি তাঁহার স্নেহ করুণার ধারা কখনই বিমুখ ছিল না। সুযোগ বা প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তিনি অনেককেই দয়াপ্রদানে কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত

হইতেন না। নানকের জননীও স্বয়ং করুণা ও কল্যাণের মূর্ত্তি-স্বরূপিণী ছিলেন।

যেরূপ কুলে বা যেমন পিতা মাতার গৃহে মহাপুরুষের আবির্ভাব, নানকের বংশ ও তদীয় পিতা মাতা ঠিক অনুরূপই ছিলেন। নতুবা অপবিত্র কলুষিত কুলে দুষ্ট পিতা মাতার গৃহে এমন কি কদাচারপূর্ণ গ্রামেও মহাপুরুষগণ কখনই আবির্ভূত হন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নানকের জন্মভূমি তিলওয়ান্দি গ্রাম যেমন সৎশান্ত অধিবাসিবর্গের আবাস ভূমি ছিল, এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও তেমনি মনোহর ছিল। এই সকল সৎ-শান্ত অধিবাসিবর্গের সাহায্যে লালিত পালিত হইয়া নানকের মহান উদার হৃদয়ের কমনীয় মধুরভাব বিকশিত হইয়াছিল।

অথবা একথা বলাই বাহুল্য যে, সঙ্গগুণে বা সাহচর্য্য-শক্তির বশে মহাপুরুষের হৃদয়ের উচ্চ ভাব বিকশিত বা বিবর্দ্ধিত হয়। কারণ—মহাপুরুষগণ জন্মাবধি হৃদয়ের মহৎ ভাব নিজ সঙ্গে লইয়াই আবির্ভূত হন। যে শক্তিবলে তাঁহারা পতিত আঁধার আচ্ছন্ন মানব-সমাজের উদ্ধার সাধন করেন, সে মহৎ শক্তি ও সদ্‌গুন-সমূহ তাঁহাদের নিজস্ব। শ্রেষ্ঠ শক্তি বা সদ্‌গুণ তাঁহারা কখনই অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করেন না—করিবার প্রয়োজনও হয় না। তবে সাধারণ স্থূল চক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গ সাহচর্য্যও মহাপুরুষদের হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতক পরিমাণে বিকাশের হেতু। এ নির্দ্দেশ সাধারণত স্থূল সত্য হইলেও, সূক্ষ্ম সত্য নহে। কারণ—মহাপুরুষগণ স্বীয় গুণ ও স্বীয় শক্তিবলেই জগতের উদ্ধার সাধন করেন, পতিত মানব-সমাজকে মঙ্গলের পন্থা পরিদর্শন করেন।

মহাপুরুষ নানক নিজগুণেই মহাগুণান্বিত মহা শক্তিশালী ছিলেন। পিতা মাতার নিকট হইতে অথবা সহচরগণের নিকট হইতে তাঁহার স্বীয় শক্তি বা গুণ গ্রাম সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বংশ গৌরব।

নানকের বংশ, ভেদী উপাধিতে বিভূষিত। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়-গৌরব সুবিখ্যাত সূর্য্য বংশ হইতে এই বেদীকূলের উদ্ভব হইয়াছে। দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

লাবর বংশ রাজবংশ-সম্ভূত। এই বংশ প্রাচীন কাল হইতে বেদবিদ্যার অধিকারী। কিম্বদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র লব ও কুশ অতি বিখ্যাত বীর ছিলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা ভারতের নানাস্থান জয় করিয়া, নিজ নিজ নামে সেই সকল স্থানের নামকরণ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোর তিনিই স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া 'লাবর' নামে তাহার নামকরণ করেন। এই লাবর নাম হইতেই নাকি ক্রমে অপভ্রংশ ভাবে 'লাহোর' নাম হইয়াছে। ইহা যে ঠিক সত্য তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ—এ সম্বন্ধে কোন ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যেমন জনশ্রুতি অনুসারে 'দিলীপ' সম্রাটের নাম হইতে দিল্লী নাম

হইয়াছে, লাহোরের নাম সম্বন্ধেও সেইরূপ লবের নাম অনুমিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অনুমানের কথা মাত্র।

এই বিখ্যাত বেদজ্ঞ বেদী বংশ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্যবংশ-সম্ভূত কুলরাও নামক জনৈক রাজা লাহোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সেই সময়ে কুলরাওর সহোদর কুলপৎ কুশরের রাজা হইয়াছিলেন।

কুলপতের শক্তি ও সাহসিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যলিপ্সা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে পাপলিপ্সা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি স্বীয় ভ্রাতা কুলরাওএর রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কুলরাও পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তথায় গমন করিয়া তিনি সেইস্থানের নরপতি অমৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃত পরম সমাদরে নিজ আশ্রয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। অবশেষে কুলরাওয়ের প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া, অমৃত স্বীয় দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

কিছুকাল পরে সতী সাধ্বী পত্নীর গর্ভে কুলরাওএর এক সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পুত্র অতিশয় বীর্য্যবান শক্তিশালী হইয়া উঠিল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অধিপতি মহারাজ অমৃত মানব-লীলা সম্বরণ করিলে, তদীয় দৌহিত্র লোদিরাও তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হয়েন। লোদিরাও বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। তিনি নিজ বাহুবলে অনেক রাজ্য জয় করেন ও স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে লোদিরাও ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে সম্মানিত ও পরিপূজিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন এইরূপে প্রবল

পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন এদেশের বহু নৃপতি তাঁহার বশীভূত হইয়া পূজোপহার প্রদান করিতে লাগিলেন।

লোদিরাও জ্ঞানপ্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া উঠিলে, পিতৃব্য কর্ত্তৃক পিতার রাজ্যচ্যুতি ও অপমানের কথা শুনিলেন। সেই কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি উপায়ে পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ও কি উপায়ে পিতৃব্য-রাজ্য জয় করিয়া লইবেন, সেই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি প্রবল বাহিনী লইয়া পিতৃব্য কুলপতের রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। লোদিরাও প্রবল পরাক্রমশালী বীর্য্যবান সম্রাট ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে কুলপৎ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইলেন। লোদিরাও, পিতৃব্য-রাজ্য অধিকার করিয়া, তথায় নিজ বিজয় নিশান প্রোথিত করিলেন। তদবধি লাহোর-রাজ্য তাঁহারই অধিকারভুক্ত হইল এবং তাঁহারই বংশাবলী তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

লাহোরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি লোদিরাও-এর পিতৃব্য কুলপৎ অতীব সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণে প্রবল বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কুলপৎ সম্বন্ধে এই অতি সুন্দর আখ্যানটি পঠিতও হইয়া থাকে। কুলপৎ বুঝিলেন রাজ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান সকলই নিতান্ত অসার—সকলই ক্ষণস্থায়ী। জলবুদ্‌বুদের ন্যায় সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য নিমিষে সমুত্থিত হয় আবার নিমিষে বিলয় হইয়া থাকে।

বিবেক বুদ্ধি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিলে এক দিব্যজ্ঞানের সমুদ্ভব হইল যে, পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় অতি

অবশ্যম্ভাবী। ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কুলপৎ যে স্বয়ং তাহা অধিকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন।

কুলপতের জনৈক অতি বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর ছিল, সে বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুলপৎ যখন স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করেন, তখন ঐ বিশ্বস্ত প্রিয় অনুচর তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল।

স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বহুদূরে আসিয়া কুলপৎ ও তদীয় অনুচর এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি নিবিড় অরণ্য। শাল, তাল, তমাল আদি বহুজাতীয় অতি বিশাল ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে সেই অরণ্য পরিপূর্ণ। এত বৃহৎ অরণ্য, কিন্তু কোথাও কোনরূপ বিভীষিকার লক্ষণ কিঞ্চিন্মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। তথাকার সকল স্থানই যেন শান্তি ও আনন্দপ্রবাহে প্রবাহিত। অত্যুচ্চ পুষ্প-পল্লবময় শাখি শাখায় বহুজাতীয় বিচিত্র বিহঙ্গকুল সুমধুর ধ্বনিতে বনভূমি আপ্যায়িত করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও পুষ্পস্তবকে বসিয়া মধুকরকুল গুণ গুণ রবে মধু বর্ষণ করিতেছে। তাহাতে শ্রোতার হৃদয় বিমুগ্ধ বিগলিত হইতেছে।

বনমধ্যে কিছুদূর গমন করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট বিষাদগ্রস্ত নৃপতি কুলপৎ অতীব শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তিনি এক বিশাল বিটপিতলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন।

বিজ্ঞ অনুচর রাজার সেই শ্রান্ত অবস্থা দর্শন করিয়া বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন—"রাজন্! আদেশ করুন। এ দাস আপনার জন্য কি করিতে পারে। অসাধ্য হইলেও এ অবস্থায় যদি আপনার আদেশ পালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে হয়, এ দাস তাহাতেও সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত।"

রাজা কুলপৎ কহিলেন, "সচিব! তুমি চিরদিন আমার অতীব বিশ্বস্ত অনুচর। আমি জানি জগতের সকলই চলিয়া যায়—সকলই সহজেই যাইতে পারে, কিন্তু তোমার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির অকপট অনুরাগ মমতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।"

এই বলিয়া কুলপৎ অতি খিন্ন মনে ও দীন প্রাণে, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া কিছুকাল অধোবদনে রহিলেন।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রাজা কুলপৎ আবার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"অনুচর! আমি তোমার মত আরও কয়জনকে অতি স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান কুব্যবহারে আমার মন সাতিশয় বিরক্ত ও পরিতপ্ত হইয়াছে। এমন কি, তজ্জন্য সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি আমার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি ইহজীবনে বা ইহজগতে এমন কিছুই নাই—যাহার উপর হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস বা নির্ভর করিতে পারা যায়। তবে যখন তোমার আচার ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি, তখন এমন দুর্দ্দশায় তাহা উপভোগ করিয়া থাকি যে, তখন মনে হয় বিধাতার একি বিচিত্র বিধান? যিনি পূর্ণিমার শশধর, সুনীল সরোবরের কমল সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি জননীর হৃদয়ে শিশুর জন্য সুধাধারা প্রেরণ করিয়াছেন, পিতা মাতার প্রাণে সন্তানস্নেহ প্রদান করিয়াছেন, আবার সেই শশধরে কলঙ্ক-কালিমা পরিলিপ্ত করিয়াছেন, কমলে কণ্টক, সর্পমুখে হলাহল প্রদান করিয়াছেন, এমন বিকট বিপরীত বিধান-বৈচিত্র্য তাঁহারই কৃত। এ বিচিত্র রহস্যের মর্ম্ম কে উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ? যাহা হউক তুমি যে এসময় আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া এমন অবস্থায় আমার অনুগমন করিয়াছ, তজ্জন্য

আমি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি। তজ্জন্য পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবানকে কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার পদে শত সহস্র প্রণিপাত করি।"

এই বলিয়া কুলপৎ অতিশয় অনুতপ্ত হৃদয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবৎ উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ভক্তিভরে কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ রহিয়া কুলপৎ কহিলেন—"সচিব! আমি নানারূপ চিন্তায় জর্জ্জরিত। তদুপরি ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। কিন্তু এ নিবিড় বনমধ্যে জল বা আহার্য্য কিছুই তো সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। এ অবস্থায় উপায় কি?"

অনুচর সচিব কহিলেন,—"রাজন্! অদূরে বৃক্ষশাখায় জলচর পক্ষি-কুলের কলরব শুনা যাইতেছে। আমার অনুমান হইতেছে কিছুদূরেই সরোবর থাকিতে পারে। আপনি একাকী এইস্থানেই অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি অন্বেষণ করিয়া আসি। দেখি যদি জল অথবা আহার্য্য ফল কিছু সংগ্রহ করিতে পারি।"

রাজা কহিলেন,—"আমার আশঙ্কা হইতেছে—যদি বিপক্ষ বৈরিগণ আমাদিগের অন্বেষণে এদিকে আগমন করে, তবেই মহা বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ—আমি লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র লোদিরাও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও ক্রূরমতি। বিশেষ পিতার অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্যই সে নিতান্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছে। সে আমাকে একবার কোন উপায়ে হস্তগত করিতে পারিলেই নিশ্চয় আমার প্রাণবধ করিবে।"

এই বলিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে আবার কহিলেন,—"অথবা তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত ও তাঁহার অবমাননা করিয়া

যে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, এইরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলেই উপযুক্ত বিধান হয়।"

সচিব বিনীত কণ্ঠে কহিলেন ;—"যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আর বৃথা অনুশোচনা করিলে কোনই ফল নাই। শাস্ত্রের বিধান এই যে, ধর্ম্ম-সাধনের জন্যই মনুষ্যের জীবন। সেইজন্যই মানব জীবনের এত মহিমা—এতই শ্রেষ্ঠত্ব। এমন জীবনকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করাই প্রত্যেক সাধু-সজ্জনের কর্ত্তব্য।"

রাজা কহিলেন ;—"আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। তুমি আর বিলম্ব করিও না। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া অতি গোপনে এইখানেই অবস্থান করিব। তৎপরে তুমি ছদ্মবেশে রাজ্ঞী ও রাজপুত্রের সন্ধানে রাজধানী অভিমুখে গমন করিও। তাহাদিগের সন্ধান পাইলে, তাহাদিগকে লইয়া এইখানে প্রত্যাগমন করিও। আমি কোনরূপে এই বনমধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী জনপদে যাইয়া জীবন যাপন করিব।"

সচিব "যে আজ্ঞা" বলিয়া ফল ও জল অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। যে সকল বৃক্ষোপরি মধুররব পক্ষিগণ কলরব করিতেছিল, সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া এক মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলেন। বিবিধ জলজপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবর পরিশোভিত করিয়াছে। তন্মধ্যে কমল নানাভাবে নানারূপে সংস্থিত রহিয়া, জলাশয়ের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। বহু কমল কোরক অবস্থায়, বহু কমল বিশিষ্টভাবে বিকশিত অবস্থায়, অবশিষ্ট অনেকগুলি কলিকা প্রসব করিয়া বিশুষ্ক দশায় অবস্থিত।

রাজমন্ত্রী, বৃক্ষপত্রের দ্বারা জলাধার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুনীল স্বচ্ছ-সরোবর হইতে সলিল সংগ্রহ করিলেন ও বিশুষ্ক কমল

হইতে কিছু বীজ ও মৃণাল সংগ্রহ করিয়া, ত্বরিত পদে রাজসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন নৃপতি আর সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই। মন্ত্রী বিস্মিত ও চিন্তাকুল হইয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে নানারূপ দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন—এই ভীষণ অরণ্য বহু জাতীয় হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল। হয়তো কোন সিংহ বা ব্যাঘ্র আসিয়া রাজাকে গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু ভূমিতল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—তাহা নহে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্তিকা, তদীয় শোণিতে রঞ্জিত রহিত। অতএব বোধ হয় রাজা কখনই হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন নাই। আবার মনে হইল—হয়তো শত্রুপক্ষীয় লোকেরা আসিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই চিন্তাটা মন্ত্রীর হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিফলিত হইল। তাহাতে চমকিত হইয়া উঠিলেন। নিমিষে তিনি বিশ্বসংসার আঁধারময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পদতলে যেন পৃথিবী থরথর কম্পিত হইতে-লাগিল। মন্ত্রী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে কিছুদুর হইতে অস্পষ্ট আর্ত্তধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মন্ত্রী, অতিঃ ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিতভাবে উত্থিত হইলেন। নিবিষ্টচিত্তে সেই ধ্বনি আবার শ্রবণ করিয়া, তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে দেখিলেন বনস্থল ক্রমেই অতি নিবিড় ও ভীষণ হইয়া উঠিতেছে।

আর্ত্তধ্বনির নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া, মন্ত্রী আত্মগোপন উদ্দেশে একটি ঘনাবৃত লতামণ্ডপের মধ্যস্থলে অতি ধীরপদবিক্ষেপে প্রবেশ করিলেন। লতাবল্লরীর অভ্যন্তরে বসিয়া চতুর্দ্দিক লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রী যে ভীষণ বিকট দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সমগ্র বিশ্ব-সংসার যেন তাঁহার নিকট নারকীয় আঁধারে পরিণত হইয়া পড়িল।

মন্ত্রী দেখিলেন—এক অতি বিকট ভীষণ দৃশ্য সম্মুখে,—নরপতি অতি কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মাটীতে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।

সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, মন্ত্রী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি উৎসাহিত হইয়া রাজার উদ্ধারের জন্য সমুদ্যত হইলেন।

এই সময়ে কতিপয় ভীষণদর্শন ভীমকায় দস্যু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া মন্ত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি দেখিয়া মন্ত্রী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—এখন কর্ত্তব্য কি? যদি এ অবস্থায় নরপতির উদ্ধারের জন্য দস্যুগণের সম্মুখে উপস্থিত হই, তবে দুর্ব্বৃত্তগণের অসির আঘাতে আমার ও নরপতির উভয়েরই মুণ্ড ছিন্ন হইবে। তাহাতে কেবলমাত্র দুইটী জীবনই বিধ্বংস হইবে, অথচ কোন ফলই ফলিবে না। অতএব এখন নীরবে রহিয়া দস্যুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। দেখা যাউক উহাদের উদ্দেশ্য কি?

এই চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রীর প্রাণে আরও অতি উৎকট ভাবনার উদয় হইল। মন্ত্রী মনে করিলেন—নিশ্চয়ই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ, দেবীর সম্মুখে বলিদান দিবে। নতুবা এমন আবদ্ধ অবস্থায় রাজাকে তাহারা দেবীর সম্মুখে রক্ষা করিল কেন?

বাস্তবিক মন্ত্রীর মনে এইরূপ ভাবনা আবির্ভাবেরই বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ যে কালের কথা উল্লিখিত হইতেছে, সেই সময়ে ভারতের নানাস্থানে বিকৃত তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল।

তন্ত্রের দোহাই দিয়া দুষ্ট কাপালিক-মতাবলম্বিগণ নরবলি প্রভৃতি অতি ভীষণ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছিল। সেইরূপ অনুষ্ঠানে সকল প্রকার সাধনায় পরম সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে ইহাই ইতর শ্রেণীর বর্ব্বর তান্ত্রিকগণের প্রাণে বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহাতে দেশময় বহু দস্যুদলের আবির্ভাব ঘটে। তাহারাও নরবলি আদি অতি নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনাদিগের দুষ্ট ব্যবসায়ের উন্নতি চেষ্টা করিত। এইরূপে নরবলি তৎকালে দুষ্টধর্ম্মের ও দুষ্ট সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রাজার ঐরূপ বন্ধন অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রীর মনে স্বততই ঐরূপ দুশ্চিন্তার উদয় হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

মন্ত্রী ভাবিলেন,—যদি একান্তই দস্যুগণ এখনই নরপতিকে বলিদান দিতে উদ্যত হয়, তবে তাঁহাকে রক্ষার জন্ত নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব। আর যদি রাজাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দুষ্ট দস্যুগণ আবার কিছুক্ষণের জন্যও অন্য স্থানে প্রস্থান করে, তবে সেই মুহূর্ত্তেই রাজার উদ্ধার সাধন করিব। তৎপরে যদি ভগবান কৃপা করিয়া এবারে রক্ষা করেন, তবেই ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিতে সমর্থ হইব।

এই মনে করিয়া রাজভক্ত মন্ত্রী নীরবে অতি গুপ্তভাবে সাবধানে সেই লতা মণ্ডপের অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন এক দস্যু অপর দস্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ওরে, আর দেরী ক'রে কাজ কি? ঠাকুর তো এখন এলো না। আয়, এক্ষণে বলির কাজ সাবাড় করে ফেলি।"

কথাটা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন কর্ত্তব্য কি? দস্যুগণের হস্তস্থিত

তরবারি যেরূপ তীক্ষ্ণধার, তাহাতে এক আঘাতেরও অপেক্ষা সহিবে না। তবে কি এখনই ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব? রাজার অঙ্গে আঘাত না পড়িতে পড়িতে কি দস্যুদলকে তীব্র বেগে আক্রমণ করিব? আমি অবশ্য ক্ষত্রবংশ-সম্ভূত। বিপক্ষের দলপুষ্টি দেখিয়া, যুদ্ধে পশ্চাৎপদ বা পরাঙ্মুখ হওয়া কখনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ আমার লোদীবংশ চিরদিন রাজরক্ষক, রাজভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। রাজার জীবন, রাজার দেহ, রাজ-সম্পত্তি রক্ষা করা আমার প্রধান ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য? সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে খড়্গ ধারণ আমার ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। এই খড়্গের সার্থকতা সাধন রাজার পূর্ব্ব বৈরিগণের দ্বারা করিতে পারি নাই। কারণ তৎকালে তদবস্থায় তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। অগত্যা তখন সে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এখন তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা সাধন করিব।'

মন্ত্রী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সবেগে সমুত্থিত হইলেন। এমন সময়ে এক দস্যু খড়্গ উত্তোলন করিয়া 'জয় মা'ই রবে ঘোর নিনাদে বনস্থলটী আলোড়িত করিয়া তুলিল। সে একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করিল, আবার নিজ কপালে খড়্গ স্পর্শ করিল। আবার ঘোর রবে 'জয় মাই' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে যখন আবদ্ধ মৃতপ্রায় রাজার গ্রীবাদেশে সবলে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, মন্ত্রী তখন আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তিনি আর কিছুতে আপনাকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইলেন না। হঠাৎ যেন সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শূন্যগর্ভে বিলীন হইল।

এখন অপর একজন দস্যু হত্যাকারী দস্যুর হস্ত ধারণ করিল এবং প্রচণ্ড স্বরে কহিল—'তুই কি করিস্?' এখনও কেন ঠাকুর

তবে এলো না। এখন কি ক'রে মাইর পূজা কর্‌বি—কেমনে বলি দিবি ?'

এই বলিয়া সে হত্যাকারী দস্যুর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার অসি সজোরে কাড়িয়া লইল।

'তখন একজন দস্যু অপরকে কহিল তবে এখন কি কর্‌বি ?'

অপর দস্যু কহিল—"চল্‌ সবাই যাই। আর বিলম্ব করিস্‌ না। সেই পূজারি ঠাকুরকে নিয়ে আসি। পূজারি ভাল ক'রে পূজা না কর্‌লে মাই পূজা নিবে কেন ?"

এই দস্যুর কথা শুনিয়া অপর সকলেই তাহাতে সম্মতি করিল। সকলেই একবাক্যে কহিল,—"বেশ ভাল কথা বলিয়াছে। চল্‌ আগাড়ি ঠাকুরকে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া দস্যুদল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

দস্যুগণ প্রস্থান করিলে পরম রাজভক্ত মন্ত্রী তীব্রবেগে আসিয়া কটিতটস্থ অসি দ্বারা রাজার বন্ধন ছেদন করিলেন। মৃতকল্প রাজার দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

পথ ছাড়িয়া বনের মধ্য দিয়া কিছুদূর আসিয়া এক অতি নিভৃত স্থলে লতামণ্ডপের মধ্যে রাজাকে রক্ষা করিয়া, শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় মলিন সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া, সেই জলে রাজার ক্লিষ্ট দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণে রাজা চৈতন্য লাভ করিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রি আমরা কোথায় আসিলাম।"

মন্ত্রী সকল অবস্থা আনুপূর্ব্বিক রাজাকে কহিয়া বলিলেন,—রাজন্‌! আমাদের বড়ই বিপদের অবস্থা। এ অবস্থায় আর কিছুকাল থাকিলে সত্বরই আমাদের উভয়ের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কারণ, দস্যুগণ

আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিবে। যদি তাহারা অন্বেষণ করিতে করিতে এদিকে আসিয়া পড়ে, তবে আমরা আর কিছুতেই রক্ষা পাইব না। অতএব সত্বর পলায়নের চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিধেয়। আমাকে ধরিয়া চলুন।

রাজা একটু বিশ্রাম লাভ করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। মন্ত্রীর স্কন্ধদেশে নিজ দেহভার রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন।

উভয়ে বহুদূর চলিয়া আসিয়া রাজা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এক অতি নিভৃত স্থলে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে বিশ্রাম করিলেন। আবার উভয়ে গমন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিবস চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের কর্ণে এক অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীতধ্বনি আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজা কহিলেন—"এ-তো বড় অদ্ভুত সঙ্গীত। ইহা বেদোক্ত সামগীত। এখানে বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন মুনিঋষিগণের আশ্রম আছে। নতুবা এমন সামগীত এমন স্থলে শ্রুত হইবেন কেন?"

মন্ত্রী কহিলেন,—"তাহাই তো মনে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্য ও কল্যাণের বিষয় বলিতে হইবে। চলুন আমরা সত্বর ঋষিগণের আশ্রমে উপস্থিত হই। তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

এই বলিয়া উভয়ে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক অতি মনোরম আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা দেখিলেন—আশ্রমস্থল আলোকিত করিয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অদূরে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যবর্গ সামগীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছেন।

রাজা ও মন্ত্রী মহাপুরুষগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ঋষিগণ উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে মন্ত্রী আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্তের পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজার অবস্থা বিপর্য্যয় হইতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক বন্ধন ও বলির চেষ্টা প্রভৃতি সকল কথাই অকপটে নিবেদন করিলেন। তখন রাজা করযোড়ে কহিলেন,—"ঋষিগণ! আমি এতদিনে উত্তমরূপে বুঝিলাম এজগতের সকলই অতি অসহায়, সকলই অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর। এ জীবনে এই জগতে গ্রহণ করিবার কিছুই নাই। এমন কোন পদার্থই দেখি না যাহা, অধিককাল স্থায়ী—যে উপভোগে বহু-কাল স্থায়ী সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যে হয়তো অদ্য সসাগরা ধরা উপভোগ করিতেছে, সে কল্যই পথের ভিখারী হইতে পারে। দেখুন আমার কি দুর্দ্দশা! আমি কয়দিন পূর্ব্বে এই প্রদেশের মর্ত্ত্যে প্রতাপশালী প্রবল নরপতি ছিলাম। আমার অধীনে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। তাহারা সকলেই অতি সমাদরে ও মহা সম্মান সহকারে চিরদিন আমার পূজা করিত ও কর উপহার প্রদান করিত। তাহাদের শ্বেতচ্ছত্র ও চামরদণ্ড আমি স্বয়ং প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতাম। আমার প্রসাদ লাভ করিয়া, তাহারা আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিত। আমার বার্ষিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে তাহারা স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া দান, বিতরণাদি সকল কার্য্য অনুচরের ন্যায় সম্পাদন করিত। তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইত না। তাহারা যে কেবল ভীতভাবে কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিত এমন নহে। আমাকে সকলেই পিতার ন্যায়

সম্মান করিয়া সকল কার্য্য সাধন করিত। ফলতঃ তাহাদের সহিত ও সকল প্রজাগণের সহিত আমার সম্প্রীতি সদ্ভাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়াই রাজকর প্রদান করিত। রাজ-ভাণ্ডার সমস্তই তাহাদের প্রদত্ত ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ রহিত। সৈন্যগণ, প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমত্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক-গণ সতত রাজভক্ত—রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিল। নগরপাল, ভট্টপাল ও চত্বরপাল প্রভৃতি রাজ্যরক্ষকগণ সর্ব্বদা অবহিত হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। এই সকল কারণে রাজপ্রাসাদ সর্ব্বক্ষণ আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত রহিত। সকল দিবসই নানারূপ আনন্দদায়ক মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। ফলতঃ আমার ও আমার পরিবারবর্গের জীবন অতীব সুখময় হইয়া উঠিয়াছিল। জানিনা—হঠাৎ কোন্ পাপে এমন ঘোর দুর্ভাগ্য মেঘে, আমার সৌভাগ্য সূর্য্য আচ্ছাদিত করিল।”

মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ধীর ভাবে গম্ভীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—“রাজন্! মানব জীবনে যা কিছু দুর্ভাগ্য, যে কোন প্রকার অসুখ বা অশান্তি সকলই পাপজ-কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর মধ্যে সকল বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ষ। এই পুণ্যক্ষেত্র পৃথিবীর আদর্শস্থল। এই পুণ্যক্ষেত্রে অধুনা পাপের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। সকল জাতি—সকল শ্রেণী—নিজ নিজ ধর্ম্ম ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে বিমুখ হইয়াছে। ভারতের জাতিসমূহ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি জাতিতে বিভক্ত। এই চারির বর্ণাশ্রমভুক্ত চারি জাতীয়-ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন।

প্রজা পালন ও প্রজা রক্ষণ ক্ষত্রিয় রাজার যেমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তেমনি

গো ব্রাহ্মণ রক্ষা করাও তাহাদিগের অতি পবিত্র কর্ত্তব্য। এই পরম ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালনে ক্ষত্রিয় রাজগণের বিশেষ ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে। উহারা আর প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্য বা ধর্ম্মসাধনের জন্য কোনরূপ সহায়তা করে না। এই দেখুন, আপনি এই প্রদেশের অধিপতি। এই বনভূমি আপনারই রাজ্যভুক্ত। এখানকার অরণ্যবাসী ঋষিগণ এখানে অবস্থান করিয়া নানারূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে আপনার ও আপনার রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, সংসারে যতপ্রকার কল্যাণের মূল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, বেদোক্ত সৎ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনই হিন্দু-সন্তানের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। আপনার এই যে মহা অশুভ ও দুর্দ্দশা সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহার কারণ—নিশ্চয়ই আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের অবহেলা জানিবেন। দেখুন—এই বনস্থলী যেমন ঋষিগণের আশ্রমস্থল, তেমনি এই দস্যুদিগের আশ্রয়ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বক্ষণই কর্ত্তব্য। আপনি তাহা করেন নাই। ইহা আপনার পক্ষে ও আপনার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলের বিষয়। পাপকার্য্য করণ যেমন অশুভকর, পুণ্যকর্ম্মের অকরণও তেমনি অমঙ্গলজনক।”

রাজা কহিলেন,—‘ঠাকুর! এসময়ে এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি?

ঠাকুর কহিলেন।—“বেদ-বিধানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আরণ্যকব্রত পরিপালন করাই বিধেয়।

মানব-জীবন নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর! মানব জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। এমন জীবন—এমন জন্ম লাভ করিয়া কর্ত্তব্য কি? এ জিজ্ঞাসা এই ভাবনা

যে মানব-জীবনে উদয় না হয়, সে মানবজীবন পশু-জীবন অপেক্ষাও অতি হীন। কেবল আহার বিহারের জন্য এ জীবন এমন জন্ম কখনই নহে। পশুরাও আহার বিহারের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। যদি কেবল আহার বিহারাদির উপভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তবে আর মানব-জীবনে প্রভেদ কি? মানব অতি উচ্চ মনোহর সৌধে সুকোমল দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করে, পক্ষিগণ উচ্চ বৃক্ষশাখায় অবস্থিত রহিয়া সেইরূপ সুখই উপভোগ করিয়া থাকে। মানব সুখাদ্য ভোজন করিয়া যেরূপ আনন্দ পায়-ক্ষীর, সর, নবনীত ভোজন করিয়া যে সুখ লাভ করে, পক্ষীরাও কীট পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া সেই একই জাতীয় সুখলাভ করিয়া থাকে। এই সকল গূঢ় তত্ত্বকথা আলোচনা করিয়া এখনই কর্ত্তব্যপন্থা অবধারণ করুন।"

রাজা কহিলেন,—'দেব, এজীবনে একমাত্র ধর্ম্ম-পন্থাই মানবের পক্ষে অবলম্বনীয়। সুতরাং মানব-জীবন লাভ করিয়া প্রথমাবধিই এই পথে পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। তবে আর বৃথা দুঃখ আর অতি অস্থায়ী অসার সংসারে অবস্থানের প্রয়োজন কি?'

ঠাকুর কহিলেন,—'সাধারণ মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল। সেই চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সুসংযত করিবার জন্য বেদোক্ত সনাতন-ধর্ম্মে কতকগুলি বিশেষ বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদনুসারে চতুর্ব্বিধ জীবনবিধি যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিরূপিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এই চারিপ্রকার আশ্রমের বিধান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। এই উৎকৃষ্ট পরম পবিত্র বিধান প্রতিপালন করিয়া জীবন-সাধক মানবগণ সমাজকে যেমন একদিকে রক্ষণ ও পরিপোষণ করেন, তেমনি অন্যপক্ষে সমাজের বিশেষ উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন।

বয়সের পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে, সুব্রাহ্মণ ও সৎ ক্ষত্রিয়গণ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, ইহাই বেদশাস্ত্রের বিধান। প্রথম জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সংযত করিতে হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে না পারিলে, মানব-জীবন পশুজীবনে পরিণত হইয়া থাকে। এমন হেয় দৃষ্টান্ত আমরা পতিত সমাজের প্রায় চতুর্দ্দিকেই পরিদর্শন করিয়া থাকি। যে জীবনে কখন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বিত হয় নাই, সে জীবন কখনই পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না। পবিত্রতা উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপান বা নামান্তর বিশেষ। ভগবান স্বয়ং পবিত্রতার স্বরূপ। মানবের ও জীবের পবিত্রতা সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শান্তি ও আনন্দ পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রশান্ত ভাব বা আনন্দ ভাব পবিত্র ভাবেরই দুই মূর্ত্তি বিশেষ। যে মানব পবিত্র নহে—যাহার জীবন পবিত্রতা দ্বারা সংশোধিত হয় নাই, সে কখনই চাঞ্চল্য বা বিষাদ বিদূরিত করিয়া, শান্তি বা আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

সংযমই পবিত্রতা লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ব্রহ্মচর্য্য সংযমের প্রধান উপায়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন দ্বারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সংযম সাধন করিতে হয়। জীবনের চাঞ্চল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া তাহাকে শান্ত ও সংযত করিতে পারিলে তখন তাহার গতি উৎকৃষ্ট উন্নত দিকে সহজেই প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে পারা যায়।

দ্বিজাতিগণ, শ্রেষ্ঠ সমুন্নত ও পরম পবিত্র জীবন লাভের জন্য জীবনের প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন দ্বারা সংযম সাধন করেন। তাহাতেই তাঁহারা জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করিয়া থাকেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেব! আমি জীবনভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। এই অবস্থায় জীবনভার আমার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। আমি চিরদিন সংসারভোগের মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্ধপ্রায় ছিলাম। ইহজীবনে রাজ্য, সম্পদ, ভোগ ও পরজীবনে স্বর্গসুখ সম্ভোগ—জীবনের একমাত্র পুরুষকার বলিয়া বোধ করিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি রাজ্য, সম্পদ ও ভোগ অতি তুচ্ছ অসার ব্যাপার। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিশেষ কোন সুখ নাই। কারণ, যে সুখ অতি অস্থায়ী তাহার আবার মূল্য কি? বিশেষতঃ এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, রাজ্য-সম্পদের সুখ সর্ব্বদাই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা-বিজড়িত। যাহা আশঙ্কা ও দুর্ভাবনাময়, সে সুখ কখনই প্রকৃত সুখ বলি গণ্য বা বিবেচিত হইতে পারে না। আরও একটু অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করিলে বুঝা যায় যে, রাজার রাজ্য বৃদ্ধি উন্নতির মূল। যে নরপতি এই উন্নতির মূল ত্যাগ করে, সে সত্বরই অধোনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কারণ—দেখিতে পাই, ইহাই প্রকৃতির বিধান যে, উন্নতির দিকে যাইতে না পারিলেই অধোনতির দিকে পতন ঘটিবেই ঘটিবে। সুতরাং রাজ্য সম্পদ সংবর্দ্ধন রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; কিন্তু দেখুন, রাজ্য-সম্পদ বর্দ্ধন চেষ্টায় বিশেষ দুঃখ, উহার রক্ষণেও তেমনি কষ্ট, আবার উহা বিনষ্ট হইলেও বিশেষ অনুশোচনা; অতএব রাজ্য সম্পদের সুখ অতি অসার তুচ্ছ। এমনি জড়পদার্থের সম্ভোগজনিত যে সুখ, সে অতি ক্ষণভঙ্গুর—অন্তবিশিষ্ট। আবার ঐ সুখ যে কেবল তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর তাহা নহে। উহার পরিণাম অবসাদ ও দুঃখময়। অতএব সাংসারিক সুখ-সম্ভোগের আশা-মরুভূমে মরিচীকাপ্রায় ভ্রমবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার আর সে সুখের আশাও নাই—আকাঙ্ক্ষাও নাই। আমি সত্যই অতীব নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াছি।'

মহাপুরুষ কহিলেন,—"রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন উহাত বৈরাগ্যসম্ভূত। আপাততঃ অবস্থা-বিপর্য্যয় বিপদ বা দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সাধু শাস্ত্রকারগণ তাহাকে শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এইরূপ বৈরাগ্যের ভিত্তি অতীব শিথিল ও দুর্ব্বল। দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই উহা অন্তর্হিত হইয়া থাকে।"

রাজা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেব! তবে কিরূপ বৈরাগ্য স্থায়ী ও দৃঢ়? আমাকে সেই কথা বিচার বিশ্লেষণপূর্ব্বক বুঝাইয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।'

এইরূপ বলিয়া রাজা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অপর সকলেও নীরব নিস্তব্ধ রহিলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন,—'রাজন্! আপনি নানাপ্রকার বিপদে অভিভূত। তদুপরি দৈহিক ক্লেশে ও মানসিক সন্তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনাদের শারীরিক অবস্থা সন্দর্শন করিয়া মনে হইতেছে, আপনারা উভয়েই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, কিছুকালের জন্য অন্তরালে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম লাভ ও ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করুন।'

'যে আজ্ঞে' বলিয়া মন্ত্রিসহ রাজা মহর্ষির অনুগমন করিলেন। অন্তরালে গমন করিয়া মহর্ষি শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা মহর্ষির সম্মুখে আসিয়া অতি বিনীতভাবে করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

মহর্ষি তাহাদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন,—'অদ্য তোমরা অতি ভাগ্যবান। অদ্য এই আশ্রমস্থল ধন্য হইল। যিনি এই প্রদেশের

রাজা, তিনি স্বয়ং মন্ত্রিসহ আজি এই আশ্রমে অতিথি হইয়াছেন। রাজোচিত সেবা দ্বারা তোমরা ইহাঁদের শুশ্রূষার বিধান কর।'

এই বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলেন। শিষ্যগণ, রাজা ও মন্ত্রী উভয়কে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নানকের আবির্ভাব-সূচনা।

রজনী প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। রাজা বিশ্রাম লাভ করিয়া মন্ত্রিসহ মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

"বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্ঞী ও রাজপুত্রগণ কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছেন?" মহর্ষি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নৃপতি উত্তরে কহিলেন—'দেব! আমি চরগণ দ্বারা পূর্ব্বেই এই শত্রুর আক্রমণ-সংবাদ পাইয়াছিলাম। তাই পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বেই তাহাদিগকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে আমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত আছি। আর দেখিতেছি যে, রাজ্য-সম্পদাদির ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মায়া মমতাও বিষম ভ্রমাত্মক মোহমাত্র। অতএব সর্ব্ববিধ মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য-পন্থা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমান বিবেক ব্যক্তির পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।'

এই বলিয়া নরপতি মহর্ষির মুখপানে সদুত্তর পাইবার প্রত্যাশায় একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মহর্ষি কহিলেন,—'রাজন্! আপনার বাক্যই উপযুক্ত বাক্য। বিশেষতঃ আপনার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈরাগ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মকে আশ্রয় করাই আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমার বিবেচনায় আপনার এক্ষণে কাশীধামে গমন করাই বিধেয়। ঐ স্থান পরম পবিত্র শিব-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে সৌভাগ্য ফলে, সাধু ও সিদ্ধগণের দর্শন লাভ হয়। তাঁহাদের কৃপায় আপনার উদ্ধার লাভ হইতে পারে। সম্প্রতি সেখানে বেদ-বিদ্যার অধ্যয়নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করুন।

'আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।' এই বলিয়া রাজা মহর্ষির আদেশ গ্রহণ করিলেন ও কয়েক দিবস এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া তিনি কাশীধামে গমন করিলেন।

কাশীধামে এক সাধু পণ্ডিতের নিকট অবস্থান করিয়া রাজা বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বেদ অধ্যয়নের ফলে রাজার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। রাজা দিব্যজ্ঞানে বুঝিলেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, সকল জীবই ভগবানের অঙ্গ বা অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা প্রপীড়ন অতীব পাপজনক।

এই কথা বুঝিয়া কুলরাওর প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি লোভপরবশ হইয়া নিজ ভ্রাতার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। অনুশোচনায় অধীর হইয়া রাজা কুলরাও, নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পুনরায় প্রস্থান করিলেন। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি বলিয়া

মাননীয় হইয়াছিলেন। এইরূপ বহু রাজর্ষি এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্ভবে এই কুল পরম ধন্য ও সম্মানিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিপূজিত হইয়াছিল।

গুরু নানক এই শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু নানক যে, জগতের উদ্ধারের জন্য এইরূপ পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। এই বংশ ক্রমে রাজ্য-সম্পদাদি হারাইয়া দরিদ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কুলের পবিত্রতা কখনই বিলুপ্ত হয় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নানকের জন্ম।

রাজ্য-সম্পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এই শ্রেষ্ঠ বংশ ক্রমশঃ দুস্থ দরিদ্র হইয়া পড়িল; কিন্তু তখনও এই বংশীয় ব্যক্তিগণ বিবিধ সৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই বংশের বহু ব্যক্তি বেদ-বিদ্যা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। বেদ-বিদ্যা অধ্যয়নে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহারা 'বেদী' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। এই বংশীয় ব্যক্তিগণ যেমন বেদ-বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনি সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র সম্পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। বেদবিদ্যায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কুলপতই এই বেদী বংশের স্থূলভিত্তি বলিয়া গণ্য হন।

পবিত্রকুল ব্যতীত মহাপুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব, ইহা যুগ যুগে প্রত্যক্ষীভূত। পবিত্র সূর্য্য-চন্দ্রবংশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বংশে কালু নামে এক শ্রেষ্ঠ সাধু সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কালু, নিজ গ্রামে ও তৎসন্নিহিত স্থানে সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।

কালু-বেদীর ন্যায় তাঁহার পত্নীও পবিত্রতা-সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী ছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্যাদিতে বিভূষিত হইয়া, তিনি সদা পরোপকার ব্রতে নিরত রহিলেন। যখনই সুযোগ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি করুণার দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক দুঃখিজনের দুঃখ বিমোচন করিতেন। প্রতিবেশিগণের কোনরূপ ক্লেশ বা অভাব অনাটন ঘটিলে, তিনি তাহা বিমোচনের জন্য সদাই যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। এমন নারীরত্নের গর্ভে যে মহাপুরুষের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মহাত্মা কালুবেদীর, প্রথমে একটি পরমা রূপবতী ও গুণবতী কন্যা হয়। ইহার কয় বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। এই সন্তানই সুবিখ্যাত সৎধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নানকের জন্মকাল ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ। তখন এদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোদী বংশ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল।

মুসলমান শাসনের প্রভাবে তৎকালে এদেশে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে বহুপ্রকার অপধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

নানক ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। পিতামাতা পুত্রের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। উভয়ের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। নানকের

পিতা দেখিলেন, কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অতি শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তিনি তখনই পরম পণ্ডিত সুবিজ্ঞকুলের পুরোহিত গৃহে আনয়ন করিলেন।

কুলপুরোহিত আসিয়া পুত্রের দেহের লক্ষণাদি সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—এই পুত্র নিশ্চয়ই মহাপুরুষ। সন্তানের দেহে যে সকল লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, সে সকল অতি শুভ লক্ষণ। সাধারণ লোকের দেহে ঐসকল লক্ষণ কখনই প্রকাশিত হয় না।

তিনি আনন্দ বিহ্বলচিত্তে পুত্রের পিতামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'মহাশয়! আমি পুত্রের দৈহিক লক্ষণ ও চিহ্নাদি দর্শন করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে মনে হয়, আপনার এ সন্তান সাধারণ সামান্য ব্যক্তি কখনই নহে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষে যেসকল লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, আপনার এই সন্তানের দৈহিক চিহ্নে সেই সকল মাঙ্গলিক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

মানব, যে যে শুভলক্ষণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কালের গতি অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে সেই লক্ষণের কার্য্যফল প্রকটিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইহাই বিধান। সেই জ্যোতিষ বিধান অনুসারেই আমার মনে হইতেছে এবং আমি সেইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির করিতেছি যে, আপনার এই পুত্র জগতে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত ও সম্মানিত হইবেন।

বিশেষতঃ যে সকল তিথি, নক্ষত্র ও লগ্ন অনুসারে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তাহাতে সন্তান যে একজন মহাপুরুষ হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই সকল সৎগুণ ও শুভলক্ষণাদি আলোচনা করিয়াই সন্তানের নামকরণ করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি অনুমতি করেন তবে আমি তদনুসারে পুত্রের নামকরণ করিতে ইচ্ছা করি।'

প্রতিবেশিনীগণ, পুত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, কালুবেদী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আনমিষ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন। এ কি অপূর্ব্ব রূপ! এ কি অলৌকিক রূপলাবণ্য! পুত্রের রূপপ্রভায় সূতিকা গৃহ সমুজ্জ্বল। পুরমহিলাগণ পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহারা মাঙ্গলিক ধ্বনিতে ভগবানের নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনা করিলেন।

বাস্তবিক নানকের জন্মকালে আকাশে বহু শুভলক্ষণ সকল প্রকটিত হইয়াছিল। অভিজিতাদি নক্ষত্রসকল প্রকাশিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিল। জল, স্থল, আকাশাদি প্রকাশভাব ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে যেন সংসার হইতে পাপ, তাপ, রজঃ, তমোভাব বিদূরিত হইয়া সত্ত্বভাব সমুদিত হইল। সকলেরই মানস যেন এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও পরমানন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার নিশীথিনীতে নানক জন্মগ্রহণ করেন। সেকাল প্রকৃতই ভারতের পক্ষে এক অতি শুভকাল। যিনি যে ভাবেই ভারতকে সমুন্নত বা সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন—ভারতের কল্যাণসাধন করিয়াছেন—তিনিই ধর্ম্মের পন্থা ধরিয়া তাহা সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাপুরুষ বা ভগবানের অবতার বলিয়া পরিপূজিত। এই ভগবানের এই সকল অবতার বা মহাপুরুষগণের মধ্যে নানক একজন যে অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নানক সত্যপথাবলম্বী, ভগবানের সত্যপন্থা প্রদর্শন করিতেই তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের অবতরণ ঘটিয়াছিল. ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

যখনই মানব-সমাজ ভগবানকে ভুলিয়া যায়—যখনই সে সংসারের মোহমদে মত্ত হইয়া তুচ্ছ ভোগ সুখে নিরত হয়—আপনার ধর্ম্ম কি—কর্ম্ম কি—এসকল কথা একেবারে ভুলিয়া যায়, তখনই ভগবান নররূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যখন পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইল—আত্মতত্ত্ব অধ্যাত্মভাব একেবারে পরিত্যাগ করিল, তখন ভগবানের অবতারস্বরূপ নানক পতিত সংসারের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইলেন।

প্রথম জন্মকাল হইতেই তাঁহার বাহ্য-লক্ষণে মহাপুরুষের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল। নানকবংশের কুলাচার্য্য তাহা দেখিয়াই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি পুত্রের পিতাকে কহিলেন—"আপনার এই পুত্র, যে সে পুত্র নহে। এই একমাত্র সন্তান হইতে আপনার কুল পবিত্র ও বংশ ধন্য হইবে। ইহার উপযুক্ত নামকরণ অতি কঠিন ব্যাপার।

এই বলিয়া কুলাচার্য্যমহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই পুত্রের নাম 'নানক নিরহঙ্কারী'।

পিতা, কুলাচার্য্যের নাম করণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ও সাদরে পুত্রের সেই নামই গ্রহণ করিলেন। পুত্রের নামকরণে কেবল যে পিতা মাতাই পরিতুষ্ট হইলেন এমন নহে, গ্রামবাসী ও প্রতিবেশিগণও তাহাতে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। বয়সের যথাকালে নানকের ক্ষত্রিয়োচিত-সংস্কারাদি সম্পন্ন হইল। পিতা মাতা উপযুক্ত বয়সে পুত্র নানককে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

নানক শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অসাধারণ প্রতিভার ফলে নানক অল্পকাল মধ্যে সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায়

উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, তৎকালে এদেশে মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়রূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তিতে তখন এদেশ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তজ্জন্য ইসলাম বিস্তারও বিশেষ বিস্তৃতি ঘটে।

নানক, তদনুসারে মুসলমানের সাহিত্য, মুসলমানের বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই ফ রসি ভাষায় 'শোনেস্তব', 'বৌদ্ধ', 'ইসলাম' প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফারসি গ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই ফারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। বাস্তবিক অসাধারণ প্রতিভাবলে নানক সকল বিদ্যাই অল্প দিনেই অধিগত করিয়া ফেলিলেন। কি স্বদেশীয় শিক্ষক, কি বৈদেশিক মৌলভি, আর কিবা নানকের পিতা মাতা, সকলেই নানকের আসাধরণ প্রতিভার গুণে বিদ্যালাভ করিতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত তেমনি প্রীত হইলেন। শিক্ষকগণ নানককে শিক্ষাদানকালে এতই আনন্দ উপভোগ করিতেন যে, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া সময়ের গতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। তখন তাহাদের মনে হইত নানক, যে সে সাধারণ বালক নহে।

সহাধ্যায়িগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া, নানক শিক্ষকমহাশয়কে পাঠ ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন, তাহাতে তাঁহারা অনেক সময় নিতান্ত বিস্মিত ও বিমোহিত হইতেন। এত অল্পবয়স্ক শিশুমুখে এ সকল কি কথা? সমপাঠিগণ নানকের কথায় নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিত।

নানক অল্পকালেই উপযুক্তরূপে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সাধারণ বিদ্যায় আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সাধারণ বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার

বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা এবং তিনি স্থূল সংসারের স্থূল বিদ্যা লাভের জন্য ততটা ব্যাকুল বা ইচ্ছুক ছিলেন না।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

যাহা জানিলে, জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, নানক সে পরম-তত্ত্ব বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। যিনি পরম বিদ্যায় অধিকারী, তাঁহার শিক্ষার জন্য স্থূলবিদ্যার সামান্য জ্ঞানের প্রয়োজন কি? জগতে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কোথায় সামান্য পার্থিব বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বা তাহা লাভের জন্য কখন ব্যাকুল হইয়াছেন?

নানক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন উপযুক্ত বয়ঃক্রম লাভ করিলেন, তখন তাঁহার পিতা কালুবেদী অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে চাকুরির চেষ্টা দেখিতে কহিলেন। পিতার আজ্ঞা সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থলে শিরোধার্য্য। বিশেষতঃ মহাপুরুষগণ নিজ দৃষ্টান্তে সমাজকে শিক্ষাদান করিতে ও তাহার গঠন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা পিতা মাতার প্রতি অচলা একনিষ্ঠ ভক্তি প্রদর্শন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

নানক, পিতার আদেশ অনুসারে কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, চিরদিনই দাসত্ব অর্থ ও সংসারের বিরোধী ছিল। তিনি মহাভাবুক ভক্ত মহাপুরুষ।

নানক অল্পবয়স হইতেই ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন। তুচ্ছ জড়ভোগ বা সংসারসুখে তাঁহার কোন কালেই আসক্তি ছিল না।

অতি শিশুকাল হইতে তিনি প্রকৃতির সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে ভালবাসিতেন। কখন বিশাল গগনের পানে একদৃষ্টে

চাহিয়া রহিতেন; কখন বিশাল গগনে চন্দ্র সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া নীরব নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট রহিতেন।

নানক সাধারণ প্রাকৃতিক লোকজনের সাহচর্য্য বা তাহাদের সহিত সামান্য কথোপকথন করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি অনেক সময় নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় ভাব চিন্তা ও উপলব্ধি করিতে ভালবাসতেন। এইজন্য সংসার ও সমাজের বাহিরে গমন করিয়া জনশূন্য বনে গমন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তথায় ফল-ফুল-শোভিত তরুলতাদি সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধভাবে বিভোর হইয়া রহিতেন। যখন বৃক্ষশাখে বসিয়া বিচিত্র বিহঙ্গমগণ সুমিষ্ট কলরবে বনস্থলী মুখরিত করিত, তখন নানকের মনে হইত যেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহারই গুণগান করিতেছে। ফল-পুষ্পের সৌন্দর্য্য, মধুকরগণের প্রস্ফুটিত পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ দেখিয়া তাঁহার মনে স্বতঃই ভগবানের সৌন্দর্য্যভাব জাগরিত হইয়া উঠিত।

নানক সর্ব্বদা সাধুসজ্জনগণের সাহচর্য্য প্রাণের সহিত ভাল-বাসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়া তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

নানক, সাধু মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভের জন্য কোন কোন সময় গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অন্বেষণের জন্য দূরদেশে মনোহর বন-মধ্যস্থ আশ্রমে গমন করিতেন। একদা এইরূপে সাধু-অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তিনি এক নির্জ্জন কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, অনেক সাধু সমাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা আলোচনা করিতেছেন। জনৈক বিশিষ্ট রাজা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।

মহর্ষি রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান

করিতেছেন। রাজা বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান ও বৈরাগ্যলাভের উপায় কি?"

একজন মহর্ষি কহিলেন,—'রাজন্! তপস্যা ব্রতাদি আচরণ দ্বারা সৌভাগ্যের উদয় হইলে, প্রকৃত প্রবলবৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। নতুবা সহজে বিবেক-বৈরাগ্য অধিগত হইবার নহে।

এ সম্বন্ধে একটি পবিত্র পৌরাণিক উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট উহা বর্ণনা করিতেছি। আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বলিতে লাগিলেন ;—কিছুকাল পূর্ব্বে তিলওয়ান্দি নামক গ্রামে দিবোদাস নামক জনৈক গৃহস্থ বাস করিত। সে নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে কিছুকাল মধ্যে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইল। যদিও ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইল, কিন্তু স্ত্রী পুত্রগণকে লইয়া সংসারে বিশেষ সুখী হইতে পারিল না। তাহাদের দুর্ব্বব্যহারে সে দিন দিন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিছুকাল মধ্যে তাহার বিরক্তি এতই বর্দ্ধিত হইল যে, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদা রাত্রিকালে দিবোদাস ভোজন ক্রিয়া সমাধা করিয়া শয়ন করিল। গৃহের পরিবারবর্গ দাস দাসীগণ তখন সকলেই শয়ন করিয়াছে। এমন সময়ে কয়েকজন সাধু আসিয়া তাহার বাটীতে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন।

দিবোদাস প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াও দীন দরিদ্রগণকে প্রতিপালন, পরোপকার ও অতিথি সেবায় কখনই পরাঙ্মুখ হয় নাই। তাহাতে তাহার প্রচুর অর্থব্যয় ও নিজের বা পরিবারবর্গের অসুবিধা

হইলেও, সে কখনই সে সকল সৎ-ব্যবহারে বিমুখ বা বিরক্ত হইত না; কিন্তু তজ্জন্য তাহার পরিবারবর্গ বিশেষ বিরক্ত হইত।

দিবোদাস তাহাদিগকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিত। পরিবারগণ তাহার সৎ-উপদেশে আদৌ কর্ণপাত করিত না। তাহারা দিবোদাসের কার্য্যকলাপে বিরক্ত হইয়া বিষম কলহ উপস্থিত করিত।

দিবোদাসের গৃহ এই কারণে বিশেষ দুঃখময় অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় যখন পূর্ব্বোক্ত সাধুগণ অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন, তখন দিবোদাস শয্যাত্যাগ করিয়া পরম সমাদর ও যত্ন সহকারে সাধুগণকে তাহার নিজ কক্ষে আনয়ন করিল। তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি প্রদান করিয়া, ভোজনের আয়োজনের জন্য পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল।

অধিক রজনীকালে অতিথির কথা শুনিয়া দিবোদাসের পত্নী অত্যন্ত কুপিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে অতি উচ্চকণ্ঠে স্বামীকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিতে লাগিল—'তোমার এই গৃহ এক্ষণে নিতান্ত দুঃখ যন্ত্রণার আলয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সংসারে বাস করায় আর কিছুমাত্র সুখ নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি এই দণ্ডেই আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দাও। নতুবা আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ইহা অতি স্থির নিশ্চয় জানিও।

গৃহিণী এরূপ উচ্চৈঃস্বরে ও উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলি কহিল যে, সাধু অতিথিগণেরও কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল।

কথাগুলি শুনিয়া অতিথিগণ নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন।

তাঁহারা অতি ব্যস্ত ভাবে দিবোদাসের ভবন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দিবোদাস অতি কাতর কণ্ঠে বার বার পত্নীকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পত্নী, স্বামীর বাক্যে আদৌ কর্ণপাত করিল না। সে ক্রমেই কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিয়া কলহ করিতে লাগিল।

দিবোদাস বুঝিলেন, এ অবস্থায় এখন পত্নীর সহিত কলহ করা বৃথা। তাহাতে কোনই ফল ফলিবে না। দিবোদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—সাধু অতিথিগণ প্রস্থান করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ দিবোদাসের প্রাণ শতধা ছিন্ন হইল। দিবোদাস জ্ঞানহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল যে সাধুগণকে ফিরাইয়া আনি। আবার ভাবিল, এ পাপ গৃহে তাঁহারা আর আসিবেন না। আবার ভাবিল, যে গৃহে সাধু অতিথিগণের স্থান নাই, সে গৃহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হওয়াই বিধেয়। অতএব আমি স্বহস্তে এই পাপগৃহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিব। এই মনে করিয়া দিবোদাস উন্মত্তের ন্যায় উত্থিত হইল। আবার ভাবিল তাহাতে ফল কি? এখন পত্নীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করাই কর্ত্তব্য। আবার ভাবিল—তাহাতে কেবল গ্রামে ও সমাজে কলঙ্ক মাত্র।

এইরূপ নানাকথা ভাবিয়া অবশেষে দিবোদাস স্থির করিল—এ সংসারে আমার আর প্রয়োজন কি? যে গৃহে ধর্ম্মাদি সৎ ও শুভ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান অসম্ভব, সে গৃহ সৎ-গৃহস্থের পক্ষে সর্ব্বদাই পরিবর্জ্জনীয়। আমার পক্ষে আর এ গৃহে অবস্থান কখনই কর্ত্তব্য নহে। বাস্তবিক আর সংসার কেন? আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। আর কয়দিনই বা এ জীবন ধারণ করিব? কত কালই বা এ সংসার-সুখ উপভোগ করিব? এতকাল ধরিয়া তো বহু প্রকারে সংসারসুখ

উপভোগ করিলাম। বিষয়, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্রাদি তো চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গে যাইবে না। এ সংসারে কে কার স্বীয় সম্পত্তি মৃত্যুর পর নিজ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিয়াছে? এ জীবনের পরিমাণ তো সত্তর অথবা আশী বর্ষ মাত্র। তৎপরে জরা মরণ অতি অবশ্যম্ভাবী —নিতান্তই অনিবার্য্য। আমার বয়ঃক্রম তো প্রায় পঞ্চাশের অধিক হইয়াছে। অতি উর্দ্ধকাল ধরিলেও আর পঞ্চাশ বা বিংশ বর্ষের অধিক কখনই এই জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। পরমায়ুর এই অবশিষ্ট কাল সাধু সজ্জনগণের সন্নিকটে অবস্থান করিয়া, হরিকথা শ্রবণ ও হরিচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য। আর এ নরকতুল্য দুঃখ-যন্ত্রণাময় সংসারে অবস্থান কখনই বিধেয় নহে। কারণ, ইহাতে আর কোনই সুখ বা শান্তির লেশ মাত্র নাই। কি আশ্চর্য্য! আমারই অর্জ্জিত ধন-সম্পত্তি, আমি ইচ্ছা অনুসারে ব্যয় করিতে পারিব না। তাহাতে স্ত্রী পুত্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। যদিও আমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও তাহারা পরিতুষ্ট বা পরিতৃপ্ত নহে। তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখনও আমি প্রাণপণে অর্থ উপার্জ্জন করি ও তাহাদের জন্যই সকল সম্পত্তি রক্ষা করি। দেখিতেছি অর্থ তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমার নিজের জীবনও তাহাদের অর্থের বাসনা পরিপূরণ করিবার জন্য। হায়! আমি কি ভ্রান্ত মূঢ়! যাহারা আমার জন্য—আমার সুখের জন্য—আমার ইহকাল পরকালের জন্য কিছুমাত্র ভাবনা করে না, তাহাদের জন্য আমি কেন প্রাণপাত করিতেছি। না—না—আর আমি এ সংসারে থাকিব না। নিশ্চয়ই সাধু সিদ্ধগণের নিকটে অবস্থান করিয়া, আমার পরকালের পথ পরিষ্কার করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবোদাসের হৃদয়ে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। দিবোদাস গৃহ হইতে প্রস্থান করাই স্থির করিল।

কোনরূপে নিজ গৃহে রজনী অতিবাহিত করিয়া, অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কাহাকেও একটিমাত্র কথা কহিল না।

দিবোদাস গৃহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমাগত উত্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। গৃহ হইতে এক কপর্দ্দকও লইয়া বাহির হয় নাই; সুতরাং চলিতে চলিতে কিছু ক্রয় করিয়া খাইবার জন্যও তাহার ইচ্ছা হইল না।

এইরূপ চলিতে চলিতে দুই দিবস অতীত হইল। দিবোদাস তখনও স্বীয় আবেগভরে সতেজে চলিতেছিল। তাহার দেহ বা প্রাণ কিছুমাত্র বিচলিত বা অবসন্ন হইল না। কেনই বা হইবে? দিবোদাস স্বভাবতঃ সাধু ও সৎচরিত্র পুরুষ। তাহার দেহ, চিত্ত দুইই দৃঢ় ও সবল ছিল।

যতই সবল থাকুক, পথশ্রান্তি ও অনাহার কতকাল আর মানবকে সবল রাখিতে পারে? তৃতীয় দিবসে দিবোদাস ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও পথশ্রান্তিতে বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। ব্রত চান্দ্রায়ণাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানের জন্য দিবোদাসের অনাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পথভ্রমণ কখনই দিবোদাসের অভ্যাস ছিল না। কাজেই তৃতীয় দিবসে দিবোদাস লোকালয়ে আশ্রয় লাভের জন্য উৎসুক হইল। দুই-দিন যাবৎ দিবোদাস অনাহারে কাটাইয়াছে এবং যেখানে সন্ধ্যা হইয়াছে সেইখানেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিয়াছে।

তৃতীয় দিবসে কিছুদুর গমন করিয়া দিবোদাস চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। পথের পার্শ্বে কিছুদূরে দিবোদাস গ্রাম দেখিতে পাইল।

সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দিবোদাস এক ধনীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল। ধনী গৃহী তখন গৃহে উপস্থিত ছিল না। তাহার গৃহিণী দিবোদাসকে সাদরে গৃহে আতিথ্য দান করিল। গৃহিণী, দিবোদাসকে

শ্রান্ত ও কাতর দেখিয়া, সত্বর তাহার স্নান-ভোজনের আয়োজন করিয়া দিল।

দিবোদাস স্নান ও ভোজনক্রিয়া সমাধা করিয়া কিছুকাল সেই গৃহেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমন সময়ে সেই ধনী গৃহী আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। অতিথির কথা জানিতে পারিয়া, ধনী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তীব্র কঠোর কণ্ঠে পত্নীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে পত্নীকে কহিল,—'তুই আমার কি এতো বিষয় সম্পদ দেখিয়াছিস্ যে, এরূপ ভাবে অপব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিস্? তোরা আমায় ঘরে থাকিতে দিবি না? ভাল, তবে তোরাই এই ঘর সংসার নিয়া আগলাইয়া থাক। আমি এখনি এ ঘর হইতে চলিয়া যাই, নতুবা তোরা এই বাড়ী হইতে চলিয়া যা, আমি একাই এই ঘরে থাকি।'

গৃহিণী অধোবদনে নীরবে রহিল। ধনী গৃহী উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—'চুপ করিয়া রহিলি কেন? আমার কথার কি উত্তর দিতে চাস্—এখনি দে।'

গৃহিণী তথাপি কোন উত্তর দিল না। পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে অধোবদনে রহিল।

ক্রুদ্ধ গৃহী বাহিরে আসিয়া দেখিল—অতিথি শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সে অতি কর্কশ কণ্ঠে দিবোদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তুমি কে হে বাপু? এই বাড়ী কি তোমার ক্রয় করা সম্পত্তি? তুমি কেন এখানে আসিয়া মহাসুখে নিদ্রা যাইতেছ? এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর। আমার মনে হইতেছে তুমি ধূর্ত্ত প্রতারক বা তস্কর। এখনি প্রস্থান না করিলে তোমাকে বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।'

গৃহীর গভীর গর্জ্জন শুনিয়া দিবোদাসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দিবোদাস ব্যস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া বিনীত ভাবে কহিল,—"মহাশয়! আমি নিতান্ত ক্লিষ্ট ও কাতর হইয়া আপনার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—অতিথি নারায়ণ স্বরূপ, অতিথি সেবায় মহাফল লাভ হইয়া থাকে।"

গৃহী কহিল,—"দেখ বাপু, ধূর্ত্ত ভণ্ডগণের এরূপ ভণ্ডামী কথা আমি এ জীবনে বহুবার বহু রূপে শ্রবণ করিয়াছি। আর আমি তোমার ভণ্ডামীর উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি না। যদি ভাল চাও তবে এখনি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।"

দিবোদাস গৃহীর কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল। সে আর তিলমাত্রকাল সে স্থানে অবস্থান না করিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

দিবোদাস যাইতে যাইতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। সংসারের একি বিচিত্র বিধান! ইহ! অবশ্য দয়াময় মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের রাজ্য। দয়াময় মঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে এমন বিকট কাণ্ড কেন? অথবা এইরূপ অদ্ভুত বিকট বৈচিত্র্যই এই সৃষ্টির বিধান। এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, ইহা পরীক্ষারও ক্ষেত্র। এই পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় এবং উহাই ধর্ম্ম সাধনার প্রকৃত স্বরূপ।

আমি মনে করিয়াছিলাম, এ সংসারে বুঝি একা আমিই হতভাগ্য—আমারই সংসার পাপতাপের আধার। এখন দেখিতেছি, জগতে আরও বহু সংসার এইরূপ পাপতাপের আধার—বহু নরনারী আমারই মত হতভাগ্য। .

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হিন্দুর পক্ষে চারি জাতীয় চারি আশ্রম

বিধেয় ও অনুষ্ঠেয়। চারি আশ্রম যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, এই আশ্রমেই অপর তিন আশ্রমের প্রাণী এবং জগতীতলস্থ অপর জীবও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। তাহাতে জীবকুল সংরক্ষিত ও পরিচালিত হয়, তেমনি সংসার আশ্রমও ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

যে সংসার-ক্ষেত্রে, যে গৃহ আশ্রমে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের নাম গন্ধ নাই, সে সংসার পাপতাপের আলয়। পাপতাপময় গৃহাশ্রম দুঃখ যন্ত্রণার আধার। তাহাতে সুখ শান্তির আশা, মরুভূমে মরীচিকা তুল্য। যে সংসারে সুখ শান্তির আশা নাই, যে গৃহাশ্রম পাপতাপময়, যে গৃহ দুঃখ যন্ত্রণার আলয়, সে গৃহ সে সংসার তো সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করাই বিধেয়; কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়াই বা ফল কি? গৃহ সংসার তো ত্যাগ করিলাম, কিন্তু জঠরজ্বালা তো কেহই ত্যাগ করিতে পারে না।

জঠরজ্বালা নিবারণ, শরীর পোষণ এবং জীবন ধারণের উপায় কি? ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ সংসারে অতি ঘৃণিত কার্য্য। কর্ম্মক্ষম, বয়স্ক, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া উদর পোষণ ও জীবন ধারণই বিধেয়। তদ্ভিন্ন চৌর্য্য, প্রতারণা বা দস্যুবৃত্তি যেমন পাপজনক, মনে হয় ভিক্ষাবৃত্তিও সমর্থের পক্ষে প্রায় তদ্রূপ পাপজনক।

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে দিবোদাস গমন করিতে লাগিল। ক্রমাগত প্রায় পক্ষকাল চলিতে চলিতে, দিবোদাস এক অতি মনোহর কানন দেখিতে পাইল। সেই কাননের পার্শ্বদেশে এক মনোহর স্রোতস্বিনীর তীরে কতিপয় সাধু আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দিবোদাস তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিল। সাধুগণ বসিয়া গূঢ় তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিলেন। দিবোদাসকে দেখিয়া তাঁহারা সহজেই বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সাধু-সজ্জনগণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যাহারা পিপাসু, তাহাদিগকে সহজেই তাঁহারা কৃপা করিয়া থাকেন।

দিবোদাসের প্রতি তাঁহাদের করুণাসাগর সহজেই উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই তাহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দিবোদাস উপবিষ্ট হইলে, সাধুগণ আবার ধর্ম্মপ্রসঙ্গের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। দিবোদাস একান্ত চিত্তে ভক্তি ভরে তাঁহাদের ধর্ম্ম কথা শুনিতে লাগিল।

সাধুগণ দিবোদাসের ভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস! তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি গৃহী ব্যক্তি। তুমি কি নিমিত্ত গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া আমাদের এই আশ্রমে আগমন করিয়াছ?'

দিবোদাস করযোড়ে বিনীত কণ্ঠে কহিল,—"প্রভো! আমি অতি অধম। আমি এতকাল পর্য্যন্ত গৃহ-সংসারে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে গৃহ-সংসারের তাপে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছি। আমি স্থির বুঝিয়াছি, সংসারের সুখ নিতান্তই অলীক ও তুচ্ছ। ইহাতে যে ক্ষণিক সুখ উপলব্ধ হয়, তাহা অতি বিষময় দুঃখ-বিজড়িত। প্রকৃত সুখ, আপনাদেরই প্রদিষ্ট পন্থায় অধিগত হইয়া থাকে।"

জনৈক সাধু কহিলেন,—'ধর্ম্মপথেই প্রকৃত সুখ। যথার্থ যাহা ধর্ম্ম, তাহা প্রকৃত সাধক সজ্জন ব্যক্তি সর্ব্বস্থলে সর্ব্ব সময়েই সাধন করিতে পারে; তাহাতে সর্ব্বত্র সে ভাগ্যবান ভগবানের কৃপায়

পরমানন্দের অধিকার লাভে সমর্থ হয়। সাধারণ অজ্ঞ লোকেই বলিয়া থাকে সংসারে সুখ নাই, ইহা তাহাদের নিতান্ত ভ্রমাত্মক কথা। ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে পারিলে, তাহাতেও পরম সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়। ভগবানে যাহার প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, সে জীবের প্রতি প্রীতি-করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে সে দ্বেষহীন দয়াবান হয়। ভগবদ্ভক্ত, সকল ভূতের মিত্র ও কারুণিক, তাহার আর দুঃখ কিসের? তাহার আবার অভাবই বা কি? ভগবদ্ভক্ত, জীবের প্রতি মৈত্রভাবাপন্ন, জন-জগতের সর্ব্বত্রই মঙ্গলময় আনন্দভাব সন্দর্শন করিয়া থাকে। কোন কালে, কোন স্থলে সে ভাগ্যবান দুঃখ দুর্দ্দশার ভাব দেখিতে পায় না।'

দিবোদাস কহিল,—'আমরা অতি অজ্ঞ, অন্ধ ও মূঢ়। আমাদের সেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি নাই। সুতরাং ভগবানের প্রতি সে ভক্তিভাব ও জীবের প্রতি প্রীতিভাব কোথা হইতে লাভ করিব? এ জীবনে কখন সাধু সজ্জনের সেবা করি নাই। তাঁহাদের জ্ঞানপূর্ণ সৎ উপদেশও শ্রবণ করি নাই। আমাদের সে জ্ঞান-ভক্তির আশা কোথায়?'

দিবোদাস এমন কাতর কণ্ঠে কথাগুলি কহিল যে, তাহার কথায় সাধুগণের মন বিগলিত হইল। তাঁহারা সকলে একবাক্যে কহিলেন—'তুমি কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সৎ উপদেশ শ্রবণ কর। তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, তুমি সর্ব্বদাই ভগবানের মঙ্গলময় ভাব দেখিতে পাইবে। তখন আর তোমার কোনই দুঃখ বা অভাব থাকিবে না।'

দিবোদাসের প্রাণ তাহাই প্রার্থনা করিতেছিল। দিবোদাস 'যে আজ্ঞে' বলিয়া অতি ভক্তিভরে বিনীতভাবে সাধুগণের পদধূলি গ্রহণ করিল।

তদবধি দিবোদাস সাধুগণের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল।

তাঁহাদের কথিত তত্ত্বকথা শ্রবণ, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিয়া, দিবোদাসের চিত্ত ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। দিবোদাস এইভাবে প্রায় ছয়মাস কাল অতিবাহিত করিল। দিবোদাস ক্রমেই ধর্ম্মের পথে সমুন্নত হইতে লাগিল।

মায়ার কি মোহিনী শক্তি! মায়া যথার্থই সর্ব্ববীজ-স্বরূপিণী। মায়ার মোহ মরিয়াও মরিতে চাহে না। প্রায় সপ্তম মাস অতিবাহিত হইলে, একদা দিবোদাস নির্জ্জনে একাকী বসিয়া জগতের কত কথা চিন্তা করিতেছে। এমন সময়ে যেন তাহার প্রাণকে আলোড়িত করিয়া, নিজ গৃহ-সংসারের কথা মনে উদিত হইল। সেই বিষয়-সম্পদ, দাস-দাসীদিগের কথা মনে হইল। সেই সুসজ্জিত ভবন, সেই ভবনের পার্শ্বস্থ মনোহর পুষ্করিণী, তৎপার্শ্বে ফুল-ফল-সমন্বিত বৃক্ষপূর্ণ সুন্দর উদ্যান—এই সকল কথাই দিবোদাসের প্রাণে, সুনীল স্বচ্ছ সান্ধ্য-গগনে নক্ষত্ররাজির ন্যায় একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি দিবোদাসের অন্তরাত্মাকে মথিত ও আকুলিত করিয়া স্ত্রী-পুত্রগণের মুখমণ্ডল মনে পড়িল।

দিবোদাসের চিত্ত, চিন্তা করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। দিবোদাস আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না।

দিবোদাস, নিতান্ত চঞ্চল হইয়া একবার উঠিতে লাগিল, একবার বসিতে লাগিল, একবার দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া দিবোদাস মনে করিল—এই কি সুখ—এই কি শান্তি? কৈ এতদিন ধরিয়া সাধুগণের সেবা করিলাম, তাঁহাদের পুণ্যময় সৎসঙ্গে এতকাল কাটাইলাম, তাঁহাদের মুখে কতই তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু মনের কলুষরাশি ও চাঞ্চল্য বিদূরিত হইল

কৈ? এ আবার কি হইল? না হইল সংসারের সুখ, না পাইলাম জ্ঞান-ভক্তি-জনিত আনন্দ। এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

ভাবিতে ভাবিতে দিবোদাস নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু প্রবলা মায়ারাক্ষসী আসিয়া তাহাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছে—সে আর কিরূপে স্থির থাকিতে সমর্থ হইবে?

উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে ভাবিতে দিবোদাস বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। দিবোদাস আপন মনে আপনি কহিল—বাস্তবিক ধর্ম্ম হইতে শান্তি। ধর্ম্ম ভক্তি ও প্রেমেরই নামান্তর বা ভাবান্তর। ভক্তি ও প্রেমভাব হইতেই মানবের প্রকৃত আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের পথ বড় কঠিন পথ। বহু সাধনায় ধর্ম্ম অধিগত হইয়া থাকে। বিষয়-বিমুগ্ধ সংসারী মানবের পক্ষে ধর্ম্মের পন্থা উৎকট কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। সহজে সংসারী মানব এ পথে পরিচালিত হইতে পারে না। প্রবল যত্ন ও চেষ্টা করিলে সকল সাধনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমি যখন সাধুগণের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, তখন এই বয়সে আর উহা পরিত্যাগ করিব না। দৃঢ় ভাবে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া রহিব।'

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবোদাসের প্রাণ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। দিবোদাস আপন মনে আপনি কহিল,—'একবার দুই এক দিনের জন্য তাহাদিগকে দেখিয়া আসি। অবশ্য এ সাধু আশ্রমের আশ্রয় কখনই পরিত্যাগ করিব না। তবে একবার চক্ষের দেখা দেখিয়া আসিব। আর অধিক বিলম্ব করিব না। এই সময়ে দ্রুত প্রস্থান করি।

এই বলিয়া দিবোদাস গমন করিতে উদ্যত হইল। একটু যাইয়াই দিবোদাস স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মনে করিল—একবার সাধুগণকে বলিয়া যাওয়া উচিত কি না? আবার ভাবিল, যদি তাঁহারা কোনরূপ বা কিছু মাত্র বাধা প্রদান করেন অথবা নিষেধ করেন, তবে তো

আর যাওয়া হইবে না; অতএব কিছু না বলিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই প্রস্থান করি।

এই বলিয়া দিবোদাস দ্রুত স্বীয় গৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিছুদিন বাটী অবস্থান করিয়া দিবোদাস আত্মবিস্মৃত হইল। ক্রমে দিবোদাসের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিবোদাসের দিব্যজ্ঞান।

দিবোদাস সংসার-মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধুগণের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। সে সংসারব্যাপারে আসক্ত হইয়া, আবার পূর্ব্বের ন্যায় গৃহ সংসারে প্রবৃত্ত হইল। এবারে দিবোদাসের চিত্ত আরও অধিক পরিমাণে সংসার-ব্যাপারে ও বিষয়কাণ্ডে বিমুগ্ধ হইল। দিবোদাস আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহব্যাপারে ধর্ম্মাদি কার্য্য বা সৎ ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইল না। দীন দরিদ্রগণ তাহার করুণাদান লাভে বঞ্চিত হইল। অতিথিগণ একবারেই তাহার গৃহে স্থান পাইল না। যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান দিবোদাস বিসর্জ্জন করিল। কেবল ধন উপার্জ্জন ও ধনরক্ষণে তাহার সমুদয় জীবনকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কিছুকাল আবদ্ধ রহিয়া মুক্তি লাভ করিলে, তাহাদের লোভ ও ক্ষুধা অধিক পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, দিবোদাসেরও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিল। তাঁহার অর্থলোভ, স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মায়ামোহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

দিবোদাস কিছুদিনে ধর্ম্মকথা একেবারে ভুলিয়া মনে করিতে লাগিল আমার অভাবে, আমার এই স্ত্রীপুত্রাদির কি অবস্থা হইবে? আমি যদি তাহাদিগের জন্য এই সময়ে ধন-সম্পত্তি বাড়াইতে বা রাখিয়া না যাইতে পারি, তবে হয়ত তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে।

এই চিন্তায় অধীর হইয়া দিবোদাস অর্থ উপার্জ্জনে ও অর্থ রক্ষণে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইল। দিবোদাস কিছুকাল পরে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অল্পদিন মধ্যেই দিবোদাস মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।

সাধু-সজ্জনগণ স্বভাবতঃই পরম করুণার আধার। দিবোদাসকে বহুকাল না দেখিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সাধুগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ মনে মনে ভাবিলেন—দিবোদাস আমাদিগকে কিছুকাল ধরিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া সে, সৎ ব্যবহারে আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। একবার তাহার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি দিবোদাসের গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনুসন্ধান করিয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে দিবোদাসের মৃত্যু হইয়াছে।

সাধু-সিদ্ধগণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকেন। তিনি দিব্য-দৃষ্টিবলে দেখিলেন, দিবোদাস পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি ফলে কুকুরজন্ম লাভ করিয়াছে। ক্ষণেক পরে কুকুররূপধারী দিবোদাস আসিয়া সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সাধু তাহার কর্ণের নিকট যাইয়া কহিলেন—'দিবোদাস! এ তোমার কি হইল? যাহা হউক, এইরূপেই তুমি আমাদের নিকট গমন কর। সেখানে সাধুগণের নিকট রহিয়া নিজকৃত পাপক্ষয় করিবার জন্য যত্নবান হও। কুকুররূপধারী দিবোদাস কহিল—ঠাকুর যাহা উপদেশ

করিতেছেন, তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। তবে আর কিছুকাল আমাকে এই বাটীতে অবস্থান করিতে হইবে। কারণ, আমার পুত্রগণ তেমন চতুর নহে। বিশেষতঃ এইখানে সম্প্রতি অত্যন্ত তস্করের উপদ্রব হইয়াছে। তাহাদের হস্ত হইতে আমার পুত্রগণ ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। তাহারা একটু উপযুক্ত হইলেই আমি গমন করিব এবং পুনরায় আপনাদিগের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিব।

'তাহাই করিও' বলিয়া সাধুপুরুষ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর কিছুকাল অতীত হইলে সাধুপুরুষের মনে আবার দিবোদাসের কথা উদিত হইল। তিনি পুনরায় দিবোদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও গৃহের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গৃহে যে একটা কুকুর ছিল, সেটা কোথায় গেল? তাহারা কহিল 'কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুকুরটির মৃত্যু হইয়াছে। সাধু মহাপুরুষ ধ্যান অবলম্বন করিয়া জানিতে পারিলেন যে,দিবোদাস এবারে ষণ্ড হইয়া তাহার গৃহে আছে। তখন তিনি সেই ষণ্ডের কর্ণকুহরে কহিলেন—দিবোদাস! আর কেন? চল এখনও সাধুগণের শরণ গ্রহণ কর। আজিও কি উত্তমরূপে বুঝিতে পার নাই যে, এ সংসার ঘোর মোহের আধার। এখানে সৎব্যক্তি ভিন্ন কেহই আপনাকে স্থিরভাবে সুপথে রাখিতে পারে না? অতএব আর বিলম্ব করিও না। এখনি আমার অনুগমন কর।'

দিবোদাস তখন ভ্রমজ্ঞানে অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহার চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বল ও মলিন হইয়াছে। সাধুর মুখে বিষয়, সম্পদ ও স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগের কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এদিকে সাধুর কথাও প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার বিশেষ লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল।

দিবোদাস অতি কুণ্ঠিত ভাবে কহিল—ঠাকুর ! এ বৎসর ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অপরের গো-মহিষাদি জন্তুগণ তাহা খাইয়া ফেলে। আমার পুত্রগণ তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ। অগত্যা আমাকে এই অবস্থায় আরও কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইবে।'

সাধু কহিলেন—'দিবোদাস ! সাবধান, আত্মবিস্মৃত হইও না। এবারের শস্য গৃহে আসিলে তুমি অবশ্যই পুনরায় সাধুগণের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিও; যেন ভুলিও না। দেখ, স্মৃতিলোপই মনুষ্যের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশের কারণ। যেহেতু, স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেই মনুষ্যের বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধির অভাবেই বিনাশ ঘটিয়া থাকে। দেখ, তুমি আমাদিগের আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া কেমন আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলে, আর আজি তোমার কি শোচনীয় অধঃপতনের অবস্থা ?

ষণ্ডরূপী দিবোদাস স্থির ভাবে সাধুর কথাগুলি শ্রবণ করিল। সাধুর কথায় তাহার হৃদয় ক্ষণেকের জন্ত বিচলিত হইল। সে আপনার অবস্থা চিন্তা করিয়া মনে মনে অতিশয় অনুতপ্ত হইল।

দিবোদাসের প্রাণের মধ্যে বিবেকের আলোক-রেখা ক্ষণপ্রভা রহিয়া রহিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। একবার মোহের আঁধার—বিষয়ের লোভ তাহার প্রাণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল, আবার বিবেকের আলোক প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। দিবোদাস কহিল,—'আপনার আদেশই শিরোধার্য্য। এবারে ক্ষেত্রের শস্য গৃহে আনীত হইলেই আমি আপনাদের পদাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব'।

দিবোদাসের কথা শুনিয়া সাঁধু প্রস্থান করিলেন। পুনরায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। দিবোদাসের আর কোনই সন্ধান নাই। সে, সংসার-

মোহে বিভোর হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে ষণ্ডদেহ দিবোদাসের মৃত্যু হইল।

দিবোদাসকে না দেখিয়া সাধুর প্রাণে দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। সাধু আর আশ্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবার আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া দিবোদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দিবোদাসের বাটীস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বাটীতে যে একটী ষণ্ড ছিল সেটি কোথায়? তাহারা কহিল ষাঁড়টি মারা পড়িয়াছে। সাধু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, দিবোদাস ষণ্ড জন্ম ত্যাগ করিয়া সর্পজন্ম লাভ করিয়াছে। গৃহের মধ্যে যেখানে ধন-ভাণ্ডার অবস্থিত, সেই ভাণ্ডারের নিম্নতলস্থ গর্ত্তমধ্যে সে অবস্থান করিতেছে। সাধু পুনরায় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের ভাণ্ডার ঘরে কি সর্পভয় হইয়াছে? তাহারা কহিল আজ্ঞে হাঁ। কিছুদিন হইতে একটা সর্প বড়ই উপদ্রব করিতেছে। ধন অর্থাদ বাহির করিতে যাইলে সর্পটি বাহির হইয়া দংশন করিতে আইসে।

সাধু কহিলেন—"তোমরা কি তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

দিবোদাসের পুত্রগণ কহিল আজ্ঞে না। সে অতি ভয়ঙ্কর সর্প। তাহার নিকট যাইতে বড় ভয় করে।"

সাধু বুঝিলেন—দিবোদাসের প্রাণে প্রবল বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ জন্মাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট অবসর, এবং এই অবসরে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।

এই বুঝিয়া সাধু-পুরুষ কহিলেন—তোমরা আমার সম্মুখে ভাণ্ডার গৃহে গমন কর। এবারে সে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না। তোমরা এবারে সেই ঘরে একবার যাইয়া দেখ। যদি সর্পটি

বাহির হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিও। সে তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। আইস, আমি তোমাদের অগ্রে গমন করিতেছি।

এই বলিয়া সাধু অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ও তাঁহার পশ্চাতে দিবোদাসের পত্নী ও পুত্রগণ যষ্টি হস্তে লইয়া গমন করিল।

পুত্রগণ আসিয়া যেমন ধনভাণ্ডার-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিল, অমনি সর্পদেহধারী দিবোদাস ভীমগর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইল।

দিবোদাসের সেই শোচনীয় অধঃপতন ও সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধু-পুরুষের প্রাণ বিগলিত হইল। সাধু, দিবোদাসের পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'আর বিলম্ব করিও না। এখনি সর্পটিকে যষ্টির আঘাতে হত্যা কর।

সাধুর কথা শুনিয়া দিবোদাসের স্ত্রী পুত্রগণ বিস্মিত হইল। দিবোদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সবিস্ময়ে কহিল—'ঠাকুর! আপনারা সাধু পুরুষ। জীবহত্যা মহা পাপ। আপনি এমন পাপের অনুমতি কেন করিতেছেন?'

সাধু কহিলেন—'অধিকাংশ জীবের যাহাতে কল্যাণ হয় ও জীবের নিজের উপকার হয়, তাহাতে পাপ ঘটে না।' দিবোদাসের পুত্রগণ তখনই সর্পরূপী দিবোদাসকে যষ্টির আঘাতে নিহতপ্রায় করিল।

তখন সাধু, সর্পরূপী দিবোদাসের নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণপুটে কহিলেন—'কেমন দিবোদাস! এখন তোমার জ্ঞান হইয়াছে কি? তুমি এতদিনে বোধহয় ভালরূপেই বুঝিয়াছ—সংসারের গতি, পরিণতি কি? ভাবিয়া দেখ, এইরূপ নানাভাবে নানা যোনিতে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ঘূর্ণিত হওয়াই সাধারণ জীবের গতিবিধি। জীবন কেবল দুঃখময় জগৎ যন্ত্রণার আধার, যাহাতে এই জীবনে বা জগতে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন না ঘটে, তাহাই সাধন করা প্রকৃত বুদ্ধিমান জীবের কর্ত্তব্য; তাহাই

সাধনা করা প্রকৃত মনুষ্যের কর্ত্তব্য। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে, মহাশক্তির জন্য সাধনা করিতে না পারে, তাহার জীবনই বৃথা। পশুজন্ম হইতে তাহার জন্ম কখনই শ্রেষ্ঠ বা সমুন্নত নহে।

অথবা ধর্ম্ম বা প্রকৃত জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া কেবল সুখ ও শান্তির বিষয় বিচার করিয়া কোন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তাহা হইলেও একটু বিচার চিন্তার ফলে বুঝিবে, প্রকৃত শান্তি বা সুখের জন্য ধর্ম্মপন্থা তত্ত্বজ্ঞানের ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য আর কিছুই নাই—আর কিছুই হইতে পারে না। সংসারে সম্পদ বা অর্থের পথে বহু বিড়ম্বনা, নানাবিধ বিরক্তি। প্রথমত ভাবিয়া দেখ, অর্থ-উপার্জ্জনে কি অসহ্য দুঃখ। অর্থ-উপার্জ্জনের তিন পথ। প্রথমতঃ বাণিজ্য, দ্বিতীয়তঃ কৃষি, তৃতীয়তঃ চাকুরি। এই তিনের মধ্যে শেষ সর্ব্বাপেক্ষা নীচ হেয়। একে পরাধীনতায় ঘোর ক্লেশ, তাহাতে নিজের ইচ্ছামত কোন কার্য্যই করিবার সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে সকল সময়ে আশঙ্কা—হয়ত এই দণ্ডে যথেষ্ট স্বচ্ছল অবস্থা, পরক্ষণেই সেই সংবর্দ্ধিত অবস্থা হইতে অধঃপতন।

বাণিজ্য হইতে বিশেষ অর্থাগমের সম্ভাবনা। কিন্তু বিপদ আপদেরও সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প নহে। অনেক সময় পরের উপর নির্ভর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিতে হয়। চারিদিকে দস্যু তস্কর সদাই আক্রমণ ও অপহরণ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। তাহাতে কেবল ধনসম্পত্তির নহে, জীবনের পর্য্যন্ত আশঙ্কা বিদ্যমান। তৎপরে কৃষির অবস্থা ভাবিয়া দেখ। ইহাতে অনেক স্থলে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় সদাই চিন্তিত থাকিতে হয়।

এই সকল অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয়, অর্থ উপার্জ্জনের পথ বড়ই ক্লেশকর ও বিপদ জনক। তদুপরি অর্থ অর্জ্জনে কষ্ট, রক্ষণে কষ্ট, আবার

অপচয়ে আরও কষ্ট। এই যে অর্থ, ইহা হইতে যে সুখ লাভ হয়, তাহা অতি তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর। যাহা দেহেন্দ্রিয়সহ সম্মিলিত হইয়া ক্ষণিক উত্তেজনা প্রদান করে, তাহার পরিণাম অবসাদজনক দুঃখকর। এই ক্ষণিক উত্তেজনাকে ইতর অন্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা পরম সুখ বলিয়া মানিয়া লয়। হায়! তাহারা কি হতভাগ্য! বাস্তবিক তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন ও দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধু সজ্জনের হৃদয় বিগলিত হয়। সেই হতভাগ্যগণ সত্যই দয়ার পাত্র।

তাহারা সামান্ত সেই তুচ্ছ সুখভোগের জন্ত অনন্ত কাল সংসারের চক্রপথে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। কোন কালেই তাহাদের চৈতন্তের উদয় হয় না। তবে ভগবানের কৃপায়—তাঁহারই অপূর্ব্ব বিধান বলে—কখন কখন কোনও হতভাগ্যের জ্ঞানচক্ষু হয় ত উন্মিলীত হয়, তখন সে বুঝিয়া লয়—কাঞ্চনভ্রমে কি তুচ্ছ কাচের আশ্রয়ে ঘুরিয়া মরিতেছি! হায়! এই কি সুখ? এই কি পরমার্থ? এই কি মনুষ্যজীবনের পুরুষার্থ? এই কি তাহার স্বার্থকতা?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রাণে অনুতাপের অনল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পাপ-পরিতপ্ত প্রাণ, তখন অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধি, লাভ করে। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, পাপ-তাপ-পরিতপ্ত প্রাণে বিবেকের দিব্য জ্যোতি বিস্ফুরিত হয়। তখন সে, তত্ত্বকথা লইয়া আলোচনা ও বিচার করিতে থাকে। এই দেহ কি— এই জীবনের স্বরূপই বা কেমন? বাহ্য যে জড়জগৎ সম্মুখে পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহার সত্যতা ও সারবত্তা কোথায়?

এই সকল গূঢ় তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে তাহার প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে—এ দেহ, এই জীবন, বাহিরের জগৎ, সকলই অতি চঞ্চল—অসার—ক্ষণস্থায়ী। উহারা সকলেই এই আছে—এই নাই।

এমন যে সামগ্রী, যাহার অস্তিত্ব অতি অস্থির, তাহাকে ধরিয়া আবার শান্তির আশা কোথা—সুখের সম্ভাবনাই বা কোথা? এই তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়া থাকে; তখন সেই ভাবুক ব্যক্তি বুঝিতে পারে কেবলমাত্র এক আত্মাই সত্য—আর সকলই মিথ্যা। দেহ, জগৎ আদি জড় ভূতগ্রাম সকলই অসার।

এই ভাবিয়া—এইরূপ বিচার করিয়া সে স্থির করে যে, এই সকল অসার-অস্থায়ী পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আত্মাকেই অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একমাত্র আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, সকলপ্রকার চিন্তা ও আশঙ্কা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়। এইরূপে দেহাত্ম-বুদ্ধি ঘুচিয়া গেলে, ভাগ্যবান মানব আত্মবুদ্ধির অধিকারী হয়, কেবল তখনই সে পরম শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মজ্ঞান ও আত্মবুদ্ধির অধিকারী, তিনি সর্ব্বত্র আত্মাকে একই পরম শান্তিময় অব্যক্ত আনন্দের স্বরূপ বলিয়া অবলোকন করেন। এই ভাগ্যবান জনই পরম মুক্ত ও মহানির্ব্বাণের অধিকারী।

জড়ভোগ—দেহেন্দ্রিয়াদির সুখ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া যিনি, সাধনবলে আত্মতত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ, কেবল তিনিই এই পরম মঙ্গলময় কৈবল্যধাম লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে বহু তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলে, দিবোদাসের প্রাণে প্রবল আত্মগ্লানির উদয় হইল। দিবোদাস, তখন স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম লিঙ্গ-দেহ ধারণ করিয়াছিল। সেই অবস্থায় সে, সেই মহাপুরুষের পদযুগল ধারণ করিয়া প্রবল অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মহাপুরুষের করুণা আশীর্ব্বাদে দিবোদাস সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দেহ ধারণ করিয়া, অপরের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন

করিল এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও দৈহিক চাঞ্চল্য-বিবর্জ্জিত হইয়া মহাপুরুষের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে একমনে একপ্রাণে নির্জ্জনে রহিয়া সাধনা করিতে লাগিল। এইরূপ সাধনার ফলে ও পরমগুরু মহাপুরুষের অনুগ্রহে দিবোদাস পরম জ্ঞান লাভ করিয়া মহামুক্তির অধিকারী হইয়াছিল।

সাধুগণের এই আখ্যান শুনিয়া, রাজা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি করযোড়ে সাধুগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা কাতর কণ্ঠে কহিলেন ;—'প্রভো ! আমি সংসারতাপে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছি। জীবন, নিতান্তই বিড়ম্বনার আধার ও ভারগ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। এই আমার একান্ত প্রার্থনা, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনাদের পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন। আর আমি সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না।'

রাজাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য—তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের উপযুক্ত অধিকারী কিনা তাহা জানিবার জন্য, মহাপুরুষ কহিলেন—'রাজন্! গৃহে আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী, ভোগ-সুখের কিছুমাত্র অভাব আপনার নাই, এমন সুখের অবস্থায় আপনি কি জন্য ক্লেশকর বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিবেন ? আমাদের মনে হয়, তাহাতে আপনি সুখ বা শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন না। কারণ—স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমতা ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্তি আপনার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু যদি মায়া বা আসক্তি তিল পরিমাণ মনের কোণে বিদ্যমান থাকে, তবে তখনই তাহারা প্রবল আকার ধারণ করিয়া আপনাকে গ্রাস করিবে। তখন আপনার পুনরায় অধঃপতন অতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। আপনি দিবোদাসের উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন ; তাহাতে

অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, শ্মশান-বৈরাগ্য অতি অস্থায়ী। কোন আত্মীয়-স্বজনকে শ্মশানে লইয়া যাইলে, তাহাকে চিতায় তুলিয়া অগ্নিতে দহন করিবার সময় যেমন সকলেরই মনে একপ্রকার বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় এ দেহ—এ দেহের ভোগ অতি অস্থায়ী, এ সংসারের সুখ-সম্ভোগ কিছুই নহে। সে সকল মরুভূমির মরীচিকা বিশেষ। ইহা অবশ্য বৈরাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু এ বৈরাগ্যের ভাব কয়জনের চিত্তে স্থায়িরূপে স্থান লাভ করে? স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া সকলেই সে ভাব ভুলিয়া যায়। এইজন্ত এই বৈরাগ্যকে শ্মশান-বৈরাগ্য বলে। এ বৈরাগ্য অতি অসার অস্থায়ী। এমনি গৃহ-সংসারের মধ্যে কোন বিশেষ বিরক্তিকর ঘটনা ঘটিলে, হয়তো সেই বিরক্তিবশতঃ মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। সে বৈরাগ্য অল্পকালেই বিলুপ্ত হইয়া থাকে। তবে তত্ত্ববিচার দ্বারা যে বৈয়াগ্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্যই স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। তত্ত্ববিচার-বলে যে বৈরাগ্য লাভ হয়, তাহা হইতে প্রকৃত সন্ন্যাসের অধিকার জন্মিয়া থাকে। নতুবা সন্ন্যাস পথ অন্য কোন উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না। দিবোদাস সংসার-বিরক্তি হইতে বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাই তাহার বৈরাগ্য কখন দৃঢ় হয় নাই, তাহার সন্ন্যাস পথও স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেইজন্যই দিবোদাসের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তাহাতো আপনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই সকল কথা উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ হয় তাহাই করিবেন। আপাততঃ কিছুদিনের জন্ম আপনি নিজ গৃহে গমন করুন। তথায় অবস্থান করিয়া নিজ অবস্থা ও আমাদের এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া সংযুক্তিতে যাহা সিদ্ধান্ত বোধ হইবে, তাহাই করিবেন।'

'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজা মহাপুরুষগণের উপদেশ শিরোধারণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।'

কিছুকাল গৃহে অবস্থিতি করিয়া রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার চিত্তে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। বিবেকের বিচার বলে তিনি সেই দৃঢ় বৈরাগ্যকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তরুণবয়স্ক নানক মহাপুরুষগণের উপদেশ বাণী অতি ধীর ও স্থিরভাবে শ্রবণ করিলেন। তিনি ভগবানের অবতারস্বরূপ মহাপুরুষ। তিনি, তত্ত্বজ্ঞান বিবেক-বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রভৃতি মহাপুরুষের মহৎ গুণসমূহ সহজাতরূপে নিজ সঙ্গে লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অপরের ভাব বা উপদেশ গ্রহণ করিবার কিছুই প্রয়োজন ছিল না।

নানক স্বয়ং যথার্থই বিবেক-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। তিনি স্থূল ভোগ বা বিষময় বিষয়-সম্পদ উপভোগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাই শিশুকাল হইতেই ভাবুক ধ্যানপরায়ণ পরমজ্ঞানের আধার নানক, নির্জ্জন স্থান প্রকৃতির লীলাস্থল বনভূমিতে সতত অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ সাধু-সজ্জনের সঙ্গলাভ করিতে, তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে উৎসুক রহিতেন।

যখনই সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইত, তখনই তিনি প্রাণের আবেগে সংসার-কোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জন স্থানে বা সাধুগণের আশ্রমে গমন করিতেন। নানকের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। প্রকৃতির প্রিয় সন্তান, প্রকৃতি-জননীর কোলে রহিতে, তথায় খেলা করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিতে ভাল বাসে, ইহাই স্বভাব।

নানকের পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনবর্গ, নানকের এই অপূর্ব্ব

মহাভাব দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইতেন। নানকের পিতা, পুত্রের এইরূপ প্রাকৃতিক ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রবল প্রচণ্ড স্রোতের গতি কে রোধ করিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ।

নানকের বাল্যজীবন।

নানক বাল্যকাল হইতেই যেন সর্ব্বদাই আত্মবিস্মৃত থাকিতেন। তজ্জন্য অনেকে তাঁহাকে একজাতীয় উন্মাদ-রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সংসারের ইহাই নিয়ম। যাহারা সংসারে আসক্ত না হইয়া উচ্চ ভাবের ভাবুক হয়, তত্ত্বচিন্তায় আত্মনিয়োগ করে, সাধারণ লোক-সমূহ তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে।

নানক আপনাকে ও সংসারকে ভুলিয়া সর্ব্বদাই গূঢ় তত্ত্বচিন্তায় তন্ময় হইয়া রহিতেন। তাঁহাকে ইতরজনগণ উন্মত্ত ভিন্ন আর কি বলিবে? তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বহির্ম্মুখীন না হইয়া সর্ব্বক্ষণ অন্তর্ম্মুখীন রহিত। স্থূল, জড় ও স্থূল জড়ভোগ ছাড়িয়া নানক, জড় ও জড়ভোগের অতীত পরম গুহ্য অতি রহস্যসঙ্কুল সূক্ষ্মভাবের ধ্যানে আত্মায় নিমগ্ন রহিতেন।

নানক, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দে নিমগ্ন রহিতেন। নির্জ্জন বনমধ্যে অনেক সময় একাকী বসিয়া তিনি মধুর রবে বিভুগুণ গান করিতেন। তখন

বাস্তবিকই মনে হইত বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই অলৌকিক অনুপম স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া নীরব নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত।

নানক, শিশুকাল হইতে জড়ভাব, স্থূল বাহ্য আচারকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিতেন। একদা স্নানকালে কতিপয় ব্রাহ্মণ জল লইয়া পিতৃপুরুষগণের ও দেবগণের উদ্দেশে তর্পণ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। নানক, তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়া জলাশয় হইতে জল লইয়া সম্মুখস্থ মৃত্তিকায় সেচন করিতে লাগিলেন। বালক নানকের ঐরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বালক! তুমি এইরূপে কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ?'

নানক, ব্রাহ্মণগণের কথার উত্তরে মৃদুহাস্যে কহিলেন;—'আপনারা জল সেচন করিয়া কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন?'

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—'আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মকে তর্পণ-ক্রিয়া কহে। এইরূপ তর্পণ-ক্রিয়া দ্বারা আমরা পিতৃলোকস্থ পিতৃগণকে জলদান করিতেছি।'

নানক হাসিয়া কহিলেন,—'আমার জনবল্লীতে একটি শস্য-ক্ষেত্র আছে। আমি সেই শস্যক্ষেত্রে জলদান করিতেছি।'

নানকের বিদ্রূপ বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন;—'এ তোমার কি ভ্রমাত্মক কথা। প্রকৃতপক্ষে ইহা তোমার আন্তরিক সত্য কথা কখনই নহে।'

নানক।—কেন?

ব্রাহ্মণগণ। এখানে জল দিলে, সে জল কখন দূরস্থ জনবল্লীর শস্যক্ষেত্রে পৌছিতে পারে?'

নানক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—'তবে আপনারা কিরূপে আপনাদের তর্পণ-ক্রিয়ার জলদানে পিতৃপুরুষদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন?'

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—'তুমি নিতান্ত অজ্ঞ বালক। তুমি ধৰ্ম্মকাণ্ডের কোন তত্ত্বই অবগত নহ। ইহা কি তুমি জান না যে, মন্ত্রের শক্তি কত প্রবল? মন্ত্রশক্তিবলে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। আমাদের তর্পণ-প্রদত্ত সলিলরাশি মন্ত্র শক্তি দ্বারা পবিত্র ও শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের তর্পণ-দত্ত সলিল নিশ্চয়ই পিতৃলোকে পিতৃগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে; কিন্তু তোমার প্রদত্ত জল কখনই শস্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইবে না। তুমি এখনও নিতান্ত বালক ও অশিক্ষিত, তাই তুমি মন্ত্রের শক্তি যে কত প্রবল তাহা জানিতে বা বুঝিতে পার নাই। অগ্রে শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর, তখনই ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য যে কি অপূৰ্ব্ব ও অদ্ভুত তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে।'

নানক, ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া নীরব হইলেন। আর অধিক বাক্যব্যয় করিলেন না। চিন্তাশীল নানক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণের কথায় ভাবুক নানকের মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'ব্রাহ্মণগণের কথা কি সত্য? মন্ত্রশক্তি কি সত্যই এতো প্রবল? মন্ত্র যদি প্রকৃত পক্ষে ভগবানে অর্পিত হয়, তবে মন্ত্রের বাক্যসমূহ অবশ্যই শক্তি সম্পন্ন হইবে বৈ কি। যিনি সকল শক্তির আধার—প্রতি অনু পরিমাণ শক্তিসমূহ হইতে সমুৎপন্ন, তাঁহার কৃপায় না হইতে পারে কি? ভক্তিভরে যে বাক্যে তাঁহাকে ডাকা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই মহাশক্তি উৎপাদন করিতে পারে। নতুবা কেবল মৌখিক বাক্যে কিছুই বিশেষ শক্তি জন্মিতে পারে না।'

নানক স্থির করিলেন—ভগবানে ভক্তি ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই—অন্য কোনই গতি বা বিধি থাকিতে পারে না। ভক্ত মাত্রেই জগতের গূঢ় রহস্যের জ্ঞাতা। তাঁহাদের নিকট কোন রহস্যই অজ্ঞাত

থাকিতে পারে না। নানক স্থির বুঝিলেন, মন্ত্রপূত বাক্য ভক্তিসম্পন্ন হইলে তাহার শক্তি সত্যই অদ্ভুত হইয়া থাকে।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনায়, নানা অবস্থায় নানকের ভক্তি-প্রবাহ দিন দিন অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিভাবে ও ভগবৎ চিন্তায় এতই বিভোর রহিতেন যে, ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত।

এ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। গল্পটি অতি ভয়াবহ ও বিস্ময় জনক। একদা নানক, গভীর অরণ্য মধ্যে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার চিন্তাধারা ক্রমে পরিপক্ক অবস্থা লাভ করিয়া ধ্যানে, অবশেষে ধ্যানধারণায়, পরিশেষে সমাধি অবস্থায় পরিণত হইল। তখন নানক তন্ময় হইয়া ভগবৎ-সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি সকলই বিভুময় দর্শন করিয়া পরমানন্দভাব লাভ করিলেন।

এমন অবস্থায়—এমন সময়ে অদূরে বনমধ্যে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন হইতে লাগিল। একটি ব্যাঘ্র, হরিণকে আক্রমণ করিবার জন্য গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, সেই ভীষণ অবস্থাতেও নানকের সমাধি ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে ব্যাঘ্র হরিণকে আক্রমণ করিল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে ও হরিণের ভীতি-বিহ্বল রবে বনভূমি আকুল হইয়া উঠিল। বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ, বনমধ্যে চতুর্দ্দিকে বনচর জন্তুগণ চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

ভীষণ শব্দে কতক্ষণে নানকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ধ্যান-নিমীলিত নেত্র ধীরে ধীরে উন্মীলিত করিয়া বনমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা

দর্শন করিলেন। দেখিলেন কিছুদূরে সেই ভীষণ ব্যাঘ্র হরিণকে স্কন্ধদেশে ধারণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

এমন ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া নানকের প্রাণে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি একমনে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে কহিলেন—'ভগবান! তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবেই বিরাজিত। এই যে ব্যাঘ্র, এই যে হরিণ, উহারা তোমারই বিভিন্ন অংশ ও রূপ-বিশেষ। এই যে ভীষণ ব্যাপার, ইহাত তোমারই লীলার একটি অঙ্গ বিশেষ। তুমি কোন্ ইচ্ছায় কখন কেমন লীলা কর, তাহা কেবল তুমি নিজেই অবগত আছ। জগতে আর কেহই তোমার প্রকটিত লীলার গূঢ় রহস্য-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।

নানক এমন কাণ্ডে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। এমন ভয়াবহ ব্যাপার নানকের চক্ষে আরও কয়বার পড়িয়াছিল। নানক সর্ব্ব অবস্থায় ধীর, অটল ও অচল রহিতেন। ভয়-ভাবনা তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিত না। ইহাই তো মহাপুরুষদিগের মহাসিদ্ধির লক্ষণ।

রাগ, দ্বেষ, ভয় এই তিনটি রাজসিক ও তামসিক ভাব হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এইরূপ মুক্ত অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বিচরণ করিতেন। বুদ্ধ শিষ্যবর্গকে উপদেশ বাক্যে সর্ব্বদাই দ্বেষ, ভয় ও কাম বিবর্জ্জন করিতে কহিতেন। বুদ্ধ তাঁহার উপদেশবাণীতে এক স্থলে বলিয়াছেন—যখন ঘোর অন্ধকারে বা ভীষণ অরণ্যে কোন ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমি তখনই অতি ধৈর্য্য সহকারে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহিতাম; তখনই আপনাকে নিজ অভ্যন্তরে আকৃষ্ট করিয়া সর্ব্বতোভাবে সংযত করিতাম। কিছুকাল এইরূপে ভীষণ-কাণ্ড ভয়াবহ ব্যাপারের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমি ভয়-ভাবনাকে

সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাভূত করিয়াছিলাম। ভয়-ভৈরব আর আমার সন্নিকটে আসিতে সমর্থ হইত না।'

শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন লীলাচল হইতে বৃন্দাবনধাম উদ্দেশে গমন করেন, তখন তিনি ছোট নাগপুরের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। তখন নাগপুরের এই পথ অতিশয় ভয়সঙ্কুল ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী ও ঘোর অরণ্য বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল পর্ব্বত ও অরণ্য-মধ্যে ভীষণ বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক অবস্থান করিত। তদুপরি দস্যু ও তস্করগণের উপদ্রবে পান্থগণের ধন-প্রাণ সদাই বিষম বিপদসঙ্কুল ছিল। সামান্য অর্থলোভে তাহারা অনায়াসে নরহত্যা করিত। তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা ভয়ের উদয় হইত না। এখনও পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে ভূমিজ নামক একটি জাতি আছে। তাহাদের প্রকৃতি ও আচারপদ্ধতি আজি পর্য্যন্ত অতি নিষ্ঠুর ভাবাপন্ন। তাহারা জীব-হত্যায় কিছু মাত্র পাপের আশঙ্কা করে না। ফলত বনের হস্তী বা ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা অতি ভীষণ স্বভাবের মনুষ্য। নাগপুর অঞ্চলে তাহারা হস্তী, ব্যাঘ্রের সহিত প্রতিবেশিভাবে বাস করিয়া স্থানটীকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ প্রদেশে এক বন্য পথে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। দিনমণি অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলেন। পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ নীড় উদ্দেশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। ভীষণ বন্য জন্তুগণ গর্জ্জন করিতে করিতে আহার অন্বেষণ উদ্দেশে আপন আপন গুপ্ত গহ্বর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর স্থান! কি ভীষণ কাল! শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি প্রেম-ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া প্রশান্ত ও প্রফুল্লচিত্তে গমন করিতেছেন। কিছু পরে এক সঙ্কীর্ণা স্রোতস্বতী তীরে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে বসিয়া সান্ধ্যক্রিয়া সমাধা করিবার জন্ত উপবিষ্ট হইলেন।

মুখ ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া ভগবানের উদ্দেশে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে হস্তী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র বন্ত জন্তগণ জলপানের জন্ত নদীতীরে উপস্থিত হইল ও ভীমরবে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নদী হইতে এক গণ্ডুষ পরিমিত সলিল লইয়া, 'হরি হরি বল' বলিয়া হিংস্র জন্তগণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

কি অপূর্ব্ব ভাব! ভক্তির কি অদ্ভুত প্রভাব! শ্রীগৌরাঙ্গ জলগণ্ডুষ নিক্ষেপ করিবামাত্র, ভীষণ হিংস্র জন্তগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্তায় নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে আত্মহারা হইয়া, আপনাদিগের স্বভাব ও হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া, একপ্রকার অস্ফুট সুমধুর ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

হঠাৎ বনস্থলী অপূর্ব্ব সর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইল। দিঙ্মণ্ডল প্রসাদভাবে পুলকিত অবস্থা ধারণ করিল। বৃক্ষশাখে পক্ষিকুল তন্ময় হইয়া আনন্দভরে বিভুগুণ গান করিতে লাগিল। বৃক্ষ-লতা, তাহাদের ফল-পুষ্প পত্র যেন হরিধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্মের এমনই অলৌকক কাণ্ড। ভক্তিভাবে যথার্থই নিতান্ত যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে। অন্ধ মূঢ় তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! মহাপুরুষগণের কি অলৌকিক শক্তি! হিংস্রজন্তগণও তাঁহাদিগের সন্নিধানে আসিয়া, সর্ব্বপ্রকার দ্বেষ-হিংসাদি ভাব পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে।

ভক্তপ্রবর মহাপুরুষ নানকের জীবনেও এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছিল। নানক বাল্যকালেও বনমধ্যে এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন

আমাদের পুরাণে কথিত আছে যে, মহর্ষিগণের আশ্রমে ব্যাঘ্র ও হরিণ একসঙ্গে বাস করিত। ব্যাঘ্র হরিণের গাত্র ঘর্ষণ করিত।

ভক্তির এমনই প্রভাব, ভক্তির ফলে, ভক্তির বলে জগতের পাপ-তাপ বিদূরিত হয়। তাহাতে রাজসিক ও তামসিক গুণসমূহ বিনষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের উদ্ভব করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা ধ্বংস হইয়া যায়। দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম ও মৈত্রী ভাব সংসারে সমুদিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রেম ও মৈত্রী হইতে সংসারে প্রেম-মৈত্রীভাবের বিশেষ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে। গল্পটি এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়।

এক ব্যাধ বাগুড়া বিস্তার করিয়া পক্ষী ধরিত। কিন্তু তাহাকে দেখিবা মাত্রই পক্ষিগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উড়িয়া পলায়ন করিত। কখন কখন দুই একটি পক্ষী ধরা পড়িত।

এইরূপে পক্ষী শিকার করিতে করিতে, একদিন দুরাচার ব্যাধ দেখিল যে, এক মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পক্ষিগণ আপনা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার গাত্রে বসিতেছে। তাহাতে মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইত; কিন্তু পক্ষিগণের ঐরূপ বিরক্তিকর কার্য্যে মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইলেও তিনি তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেন না। তিনি তজ্জন্য কখনও কোনও পক্ষিকে আঘাত আক্রমণ করিতেন না। বরং তাহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতেন। বিহঙ্গমকুল মহাপুরুষের সাহচর্য্যে পরম আহ্লাদিত হইত। তাহারা যেন স্বতই তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিত। তাঁহারা যেন মহাপুরুষের সহিত সেইরূপ খেলা করিতেই ভালবসিত।

জীবের প্রতি মহাপুরুষের প্রেম-মৈত্রী ভাব এমনই প্রবল ছিল যে, তিনিও যেন তাহাদিগকে দেখিয়া ও নিজ নিকটে পাইয়া পরম আনন্দিত হইতেন। প্রেম-মৈত্রীভাব যে যথার্থ ই প্রেম ও মৈত্রী ভাবের বিকাশ সাধন করে, ইহাই তো তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নতুবা পক্ষিকুল আনন্দ ভরে মহাপুরুষের নিকট আগমন করিবে কেন? আর কেনই বা তাহারা ব্যাধকে দেখিবা মাত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিবে?

নির্ব্বোধ দুরাচার ব্যাধ ভাবিতে লাগিল, পক্ষী ধরিবার ইহাই তো অতি সহজ প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব আর মিছামিছি বহু আয়াস স্বীকার করিব কেন? সাধু মহাজনের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া স্থির-ভাবে নয়ন মুদিত করিয়া উপবিষ্ট রহিলে পক্ষিগণ আসিয়া গায়ে বসিবে, তখন অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিতে পারিব।

ইহা স্থির করিয়া ব্যাধ গেরুয়া বসন ও নামাবলি সংগ্রহ করিল। তৎপরদিবস সে সাধুর যোগাসনের কিছুদূরে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ যোগি-জনের ন্যায় অতি ধীর স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। বিহঙ্গমগণ দুষ্ট ব্যাধকে সিদ্ধ সাধু মনে করিয়া উড়িয়া আসিয়া তাহার গায়ে পড়িতে লাগিল। ব্যাধ তাহাদিগকে অনায়াসে ধরিবার সুযোগ লাভ করিল।

তখন দুষ্ট ব্যাধের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। ব্যাধ মনে করিল, যখন কেবল মাত্র সাধুর বেশে, সাধুর ভাবে, এমন ঘটনা ঘটিতে পারে—যখন বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত হয়, তখন সাধুর প্রকৃত ভাবে কি অসাধ্য কাণ্ডই না সংসাধন করা যাইতে পারে। এই ভাব ক্রমে গাঢ় ঘনীভূত হইয়া দুরাচার ব্যাধকে পরম সাধুরূপে পরিণত করিয়া তুলিল। সাধুরূপী ব্যাধ পূর্ব্বের দুরাচার ভুলিয়া, পশু বধাদি নিষ্ঠুর আচরণ পরিত্যাগ করিয়া, একমনে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহার মন হইতে দ্বেষ হিংসা আদি দুষ্ট ভাবসমূহ

বিদূরিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে দয়া, প্রেম, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি সৎবৃত্তি সমূহ বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার ফলে, তাহার সান্নিধ্যে ও সংস্রবে যে হিংস্র জীব আসিতে আরম্ভ করিল, তাহারা পর্য্যন্ত সাম্য প্রেমিক হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহা অতি নিগূঢ় সত্য যে, জগতের সকল সৎভাব সৎভাবকেই বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে এবং সর্ব্ববিধ অসৎভাব অসৎভাবেরই বিকাশ বিবর্দ্ধন করে।

দুষ্ট দুরাচারগণ সংসারে আসিয়া যেমন কুপ্রবৃত্তি সমূহ জাগাইয়া, জগতের পাপ-তাপ পরিবর্দ্ধন করে, তেমনি সাধু মহাজনগণ আবির্ভূত হইয়া সৎগুণরাশি অভিব্যক্ত করিয়া জগতের পাপ-তাপ হরণ করেন। ইহাই ভগবানের অপূর্ব্ব বিধান। তাই সংসারের পাপতাপ যখন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, দুরাচারগণ কদাচারে মানব সমাজকে অধোনত করিতে থাকে, তখনই ভগবানকে স্বয়ং অবতরণ করিতে হয়। তিনি তখন জগতে আবির্ভূত হইয়া পাপাচারী পাপিকুলকে বিধ্বংস করিয়া সাধু সজ্জনগণকে সংবরণ করিয়া থাকেন।

মহাপুরুষগণ—ভগবানেরই অংশ। তাঁহারা মানব-সমাজের পাপতাপ বিনাশ করিয়া সংসারসংরক্ষণে, সমাজের কল্যাণ সাধনে সৎগুণ-সমূহের অভিব্যক্তি ও বিকাশ সাধন করেন। যাহা কিছু সৎ শুভ মঙ্গল জনক সে সকল তাঁহাদের নিজস্ব। অবতরণ কালে, তাঁহারা সৎগুণসমূহ নিজ সঙ্গে লইয়াই আসিয়া থাকেন। মহাপুরুষ নানক শিশুকাল হইতেই সকল শুভপ্রদ সৎগুণের আধার ছিলেন। সৎগুণ নামের জন্য কোন সমাজ বা শিক্ষকের নিকট তাঁহার আর শিক্ষা বা সাধনা করিতে হয় নাই।

মহাপুরুষ নানক অতি শৈশব দশা হইতেই দ্বেষ হিংসা-বিহীন, দয়া ও করুণার আধার ছিলেন। জীবের প্রতি মৈত্রী ও দয়া নানকের প্রাণে

সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তাই অতি হিংস্র বন্য জন্তুগণও তাঁহাকে দেখিয়া হিংসা ভাব প্রকাশ করিত না।

নানক কোন কালেই ভয়ের অধীন ছিলেন না। ভয় যেন সর্ব্বকালেই তাঁহার নিকট ভীত সঙ্কুচিত হইয়া রহিত। বালক কালে নানক অনায়াসে মহা সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় ভীষণ ষণ্ড ও মহিষাদি পশু-গণের সম্মুখে যাইতে কিছুমাত্র ভয় করিতেন না। তাহারা নাকি তাঁহাকে দেখিয়া স্বতঃই নতশির হইত।

বাস্তবিকই ভয়-হিংসা যাঁহাদের প্রাণে স্থান পায় না, তাঁহারা অপর ভূতগণকে ভয় করিবার বা হিংসা করিবার জন্য কখনই বাসনা করেন না, অপর ভূতগণও তাঁহাদিগকে ভয় বা হিংসা করে না। মহাপুরুষগণ সর্ব্বক্ষণই মৈত্রী-করুণার মৌলিক উৎস স্বরূপ। জীবকে দয়া করিতে, মানব-সমাজে প্রেম বিতরণ করিবার জন্যই যে তাঁহাদের জীবন— তাঁহাদের অবনীতে অবতরণ। দয়া, প্রেম দান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি বিকাশ করিয়া, মহাপুরুষগণ পতিত মানব-সমাজের উদ্ধার সাধন করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নানকের সাধক জীবন।

নানক প্রথমাবধি সামান্য বিষয়-জ্ঞান বা অপকৃষ্ট তুচ্ছ বিদ্যার প্রতি-কূল ছিলেন। তিনি সামান্য আক্ষরিক বিদ্যা বা বৈষয়িক শিক্ষা লইয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। সেরূপ জ্ঞানবিদ্যাকে তিনি অতি স্থূল জড়-ভাবাপন্ন বলিয়া উপেক্ষা করিতেন।

পঠদ্দশায় একদা নানক শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষাদান করিতে দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, —

"শুন পাণ্ডে কিয়া লিখো জঞ্জালা।
লিখো রাম নাম গুরুমুখ গোপালা॥"

অর্থাৎ, পণ্ডিত মহোদয়! কি অসার তুচ্ছ শিক্ষাদান করিতেছেন? ভাবিয়া দেখুন যে, এ জীবনে একমাত্র সার শিক্ষার বিষয় গুরুমুখদত্ত 'রামগোপাল' নাম; তাহা ব্যতীত শিখিবার আর কিছুই নাই।

শিক্ষাকাল হইতেই নানকের ধারণা ছিল যে, ভগবানের তত্ত্বকথা ভিন্ন আর জানিবার বা বুঝিবার অথবা শিখিবার কিছুই নাই। যদিও নানকের এইরূপই দৃঢ় ধারণা ছিল, তথাপি সাধারণ লেখাপড়া শিখিতে তাঁহার আলস্য বা ঔদাসীন্য ছিল না। তাহা হইলে তিনি কখনই অল্পকালে স্বজাতীয় ভাষা, ফারসি ও সংস্কৃত বিদ্যায় অমন ব্যুৎপন্ন হইতে পারিতেন না; গণিত-শাস্ত্রেও উৎকৃষ্ট অধিকারী হইতে পারিতেন না। নানক, ফারসি ও সংস্কৃত বিদ্যায় এমনই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, ফারসি ভাষায় মৌলবীর সহিত ও সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপক পণ্ডিতের সহিত অনায়াসে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। সে বৃত্তান্ত পরে উল্লিখিত হইবে।

নানকের ভাব-ভঙ্গি ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনবর্গ বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও চিন্তান্বিত হইলেন। কি উপায়ে পুত্রের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হয়, কিসে সংসারে তাহার আসক্তি জন্মে তাহারই উপায় পিতা-মাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নানক যাহাতে বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার পিতা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যতই সে জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নানকের চিত্ত ততই বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি

আসক্ত এবং বাহ্য বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিল। তিনি অনেক সময় এমন গূঢ় জ্ঞানমার্গের কথা কহিতেন যে, তাঁহার পিতা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন।

নানকের উপনয়নের কাল উপস্থিত হইল। যথাসময়ে তাঁহার পিতা-মাতা নানকের উপবীত ধারণের জন্য ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানক বাহ্য ব্যাপার, বাহ্য অনুষ্ঠানে চিরদিনই উদাসীন ও বিরক্ত ছিলেন। নানকের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে বাহ্য উপবীত ধারণ করিলে কোনই ফল ফলে না। কেবল দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিলে যে মানব পবিত্র হয়, অথবা উপবীত গ্রহণ ও ধারণ করিলেই যে মানব উন্নত পদবীতে আরূঢ় হয়, তাহা নহে। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সৎচিন্তা, সৎভাবের আলোচনায় হৃদয় উন্নত হইলে মানব আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

এই ধারণার বশীভূত হইয়া নানক উপবীত ধারণে অসম্মত হইলেন। পিতা, উপবীত ধারণের প্রস্তাব ও আয়োজন করিলে, নানক কয়েকদিন অন্যস্থানে গমন করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। অবশেষে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানক দেখিলেন বারবার পিতা-মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা পুত্রের পক্ষে বিধেয় নহে। তখন তিনি অগত্যা উপবীত গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

উপবীত গ্রহণ কালে নানক আচার্য্যকে কহিলেন—"এই বাহ্য সূত্র ধারণের ফল কি? যে হতভাগ্য দুরাচার দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত থাকে, এই সামান্য সূত্র কি তাহাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? সন্তোষই যথার্থ যজ্ঞসূত্র। সেই সন্তোষরূপ সূত্র ধারণ দ্বারা যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ দমন করিতে পারা যায়, ও তদ্দ্বারা সত্যরূপ দণ্ড ধারণ করা যায়, তবেই মানবের পাপ-

তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ; তাহাতেই নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়।”

বালক পুত্রের মুখে এইরূপ বৃদ্ধের ন্যায় বচন শ্রবণ করিয়া নানকের পিতা-মাতা বিরক্ত হইলেন ও পুত্রকে ভৎ র্সনা করিতে লাগিলেন। শান্ত সচ্চরিত্র পুত্র নানক, পিতার কথায় নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহাতে আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

নানক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে উপবীত ধারণ করিলেন ; কিন্তু নানক কখনই সাংসারিক কার্য্যে নিরত হইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই অনাসক্তভাবে নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসিতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পুত্রের এই উদাসীন ভাব, ও নির্জ্জনে অবস্থিতি দেখিয়া পিতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ মনে করিলেন, নানকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। তাঁহারা কেহ কেহ কহিলেন, নানকের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে ; সত্বর তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হউক। কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাহার সহিত নানকের বিবাহের ব্যবস্থা করা হউক।

নানকের পিতা কালুবেদী বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রকে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, সংসারে অর্থ অতিশয় প্রলোভনের সামগ্রী। নানকের হস্তে অর্থ সমাগম ঘটিলে, নানকের এই সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও বিষয়-বৈরাগ্যভাব বিদূরিত হইবে।

ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রকে আহ্বান করিয়া সংসার ও গৃহাশ্রম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন ও কহিলেন—দেখ বৎস ! তোমার এরূপ

বৈরাগ্য ভাব সংসারী গৃহাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অবিধেয় বিকট ব্যাপার। ভাবিয়া দেখ, তুমি যে ভাব অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে বোধহয় সংসার আশ্রম প্রতিপালন করিবার তোমার আর ইচ্ছা নাই। ইহা কখনই সৎপুত্রের উপযুক্ত কার্য্য নয়। কারণ—বিধাতার ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট বিধান যে, বাল্যকালে অসহায় পুত্রকে পিতা-মাতাই লালন-পালন করিয়া থাকে। ইহা যে কেবল মনুষ্য জাতির বিধান এমন নহে। পশু-পক্ষিগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। ইতর পশু-পক্ষীরাও আপন আপন সন্তান লালন-পালন করিয়া থাকে।

পিতা-মাতা বৃদ্ধ হইলে, মনুষ্যগণ তাহাদিগকে সেবা-পালন করিয়া পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করে, ইহা নিশ্চয়ই পরম পবিত্র সনাতন বিধান; ইহা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান বলিয়াই মানিতে হইবে। এই বিধান উল্লঙ্ঘন করিলে জীব-প্রবাহ বিধ্বংস হইয়া যায়।

এখন উত্তমরূপে বুঝিয়া দেখ, তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিতেছ, উহা কখনই বিধাতার বিধান সম্মত হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংসার-ধর্ম্ম পালনে তুমি আর সমর্থ হইবে না। আমরা তোমার পিতা-মাতা, কত কষ্ট করিয়া তোমায় লালন-পালন করিয়াছি; আমরা এক্ষণে বৃদ্ধ অবস্থায় নিপতিত প্রায়। এমন অবস্থায় এ সময়ে আমাদিগের সেবা ও প্রতিপালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া তুমি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর ও গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য পথে প্রস্থান কর, তবে তাহাতে তোমার কি যথার্থ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে? না—তাহা কখনই হইবে না। যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, নিজ কল্পিত ধর্ম্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার কখনই সৎ-সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। তাহাতে পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপেরই সঞ্চয়

হইয়া থাকে। তাহাতে আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিবে। সৎশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে জীবমাত্রই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ। যে হতভাগ্য দুরাচার সেই পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিমান না হইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করে, তাহার ইহকালে কোন সুখ লাভ হয় না, পর জীবনেও স্বর্গসুখ বা শান্তি উপভোগ ঘটে না।

"সনাতন বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুর চারি আশ্রম। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, দ্বিতীয় বয়সে গৃহ আশ্রম, তৃতীয় বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রম, শেষকালে সন্ন্যাস আশ্রম। এক একটি আশ্রম-ধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলে পরবর্ত্তী আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। এইরূপে প্রথম আশ্রমের পর দ্বিতীয় আশ্রমে, দ্বিতীয় আশ্রমের পর তৃতীয় আশ্রমে, তৃতীয় আশ্রমের পর চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। যে পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমের কার্য্য সাধন না করিয়া পরবর্ত্তী আশ্রমে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তাহার কোন ধর্ম্মই সাধন হয় না। সে কখনই প্রকৃত মুক্তির পথ লাভ করিতে পারে না। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ-অন্ধ। তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এখনও বুঝিতে পার নাই। তাই তোমার এইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছে।"

নানক, পিতার বাক্য নীরবে অতি শান্ত-সমাহিত ভাবে শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন—'পিতঃ। সংসার সত্যই অতি অসার। এইত এতকাল জীবন ধারণ করিলেন। কতই দেখিলেন—কতই শুনিলেন; কিন্তু এই সংসারে—এই জীবনে এমন কি সামগ্রী দেখিয়াছেন, যাহা চিরস্থায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ? বোধ হয় এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা স্থায়ী বলিয়া জগতে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে সংসারে সকলই অস্থায়ী। যাহা অস্থায়ী তাহার আবার মূল্য কি? সত্যতা সারবত্তাই বা কি? যাহার স্থায়িত্ব নাই—যাহা নিতান্ত

ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে নির্ব্বোধ ব্যতীত কে আস্থাবান হইয়া থাকে? দেখুন—সামান্য জড়পদার্থ তো দূরের কথা, এমন যে জীবন, যে জীবনের জন্য মনুষ্য এত ব্যস্ত, তাহারই বা মূল্য কি? সে জীবনও তো এই আছে এই নাই। দেখুন—এই একই গ্রামে, আপনারই জীবনকাল মধ্যে কত লোক জন্মগ্রহণ করিল, কত লোক জলবুদ্বুদের ন্যায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। এই মনুষ্য দেহ, মনুষ্য জীবনেরই বা গৌরব গুরুত্ব কি?

বাস্তবিক যে ভাবিতে ও গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারে, সে একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারে যে, এ জীবন বা জগতের কোনই মূল্য নাই। তাই এই কথাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে হয় যে, জীবনের সম্ভোগে বা বিষয়াদির বাসনায় কখনই প্রকৃত সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। এই সংসারে কত ধনী বড়লোক আছে, তাহারা কি প্রকৃত পক্ষে সুখী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? আমার মনে হয়—বিবেচক সাধুগণও তাহাই বলিয়া থাকেন, যে যে পরিমাণে বিষয় বিভবের অধিকারী, যে যে পরিমাণে বিষয়-সম্ভোগে আসক্ত, তাহার দুঃখ-যন্ত্রণা সেই পরিমাণে অধিক। তাহার দুর্ভাবনা ততই বাড়িয়া উঠে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সুখকর সামগ্রী সম্ভোগ করিতে করিতে সে হতভাগ্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের সৎগুণ-সমূহ একেবারে হারাইয়া ফেলে। সে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব লাভ করে। পশু-জীবনের যাহা সুখ, তখন তাহাই তাহার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপাদেয় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। আহার, বিহার আদি নিকৃষ্ট ভাবসমূহ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে। সে অন্ধ, মূঢ় হইয়া মনুষ্য-জীবন অতিবাহিত করে। ক্রমে অধম হইতে অধমতর নিকৃষ্ট যোনিতে নিপতিত হইয়া জন্ম জন্ম তামসিক জীবন ভোগ করিতে থাকে। সেই হতভাগ্যের আর উন্নতির আশা থাকে না, উদ্ধারের

পথও থাকে না। মনুষ্য-জীবন লাভের ইহা কি শোচনীয় পরিণতি!

মনুষ্য-জীবন, মনুষ্য-জন্ম যথার্থই অতি দুর্লভ জীবন, দুর্লভ জন্ম। এমন জীবন এমন জন্মলাভ করিয়া যদি তাহার সদ্ব্যবহার করা না হয়, তবে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা মনুষ্যের পক্ষে আর কি হইতে পারে? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—অপর সকল জন্ম—সর্ব্ববিধ জীবন কেবল ভোগের জন্য।

ভোগ দুই প্রকার—এক দুঃখভোগ, অপর সুখভোগ। উভয়ই পারস্পরিক সম্বন্ধে অন্বিত। একটি অপরটির অনিবার্য্য অপরিহার্য্য সহচর। যেখানে দুঃখ সেইখানেই সুখ, আবার যেখানে সুখ সেইখানেই দুঃখ অবস্থিতি করিবেই করিবে। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ ঘূর্ণিত চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন করিতেছে। ইহাই সংসারের নির্দ্দিষ্ট বিধান। এই বলবান বিধানকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যতকাল সংসারে অবস্থিতি, ততকাল এই সুখ-দুঃখের বিধানকে ভোগ করিতেই হইবে।

এই গূঢ়কথা বিচার করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র সুখ-দুঃখের বিষয় বিবেচনা করিলে, সংসারের ও সম্পদের সারবত্তা বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। তদুপরি প্রকৃত সুখ ও শান্তির বিষয় বিচার করিলে, একমাত্র ধর্ম্ম-সাধনাতেই মানব-জীবনের সত্যতা সারবত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখুন, এই জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু? অনন্ত কালের সহিত তুলনা করিলে, এই জীবনকে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষণভঙ্গুর জলবুদ্বুদের তুল্য বলিয়াই সহজে বুঝা যায়। নিতান্ত অজ্ঞ মূঢ় ভিন্ন এই জীবনের সুখ-সম্ভোগ লইয়া কেহই ব্যগ্র হইতে পারে না। বিবেচক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই জীবন-যজ্ঞের

কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা জন্মে, এই জীবনভার বহন করিয়া কি করিব ? কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান মানব জীবনের প্রকৃত উপযোগী।

এই জিজ্ঞাসা হইতে বুদ্ধিমান মাত্রেরই প্রাণে সিদ্ধান্ত হয় যে, সামান্ত জীবনের ভোগ-সুখ অতি তুচ্ছ। যাহাতে অনন্ত কালের সুখ-শান্তি অধিগত হইতে পারে, সেই কর্ম্মই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত উপযোগী। মিথ্যা অস্থায়ী বিষয়ের ভোগ হইতে যে সুখ সংঘটিত হয়, তাহা অতি তুচ্ছ হেয়।

তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হয়, সত্য স্থায়ী বিষয় জগতে কি ? বাস্তবিক অস্থায়ী জগতের সকলই অসার অস্থায়ী, মিথ্যা মায়া মাত্র যাহা জগতের অতীত, জড় ব্যাপারের সম্বন্ধাতীত তাহাই সত্য— তাহাই অনন্তকালস্থায়ী—তাহাতেই অনন্ত সুখ পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

জগতের সকল শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র—সমুদয় জ্ঞানী সাধুজন একবাক্যে বলেন যে একমাত্র ভগবানই জগতের অতীত। একমাত্র তিনি সকল কল্যাণের আধার—কেবল তিনিই পরমানন্দের উৎস। মন-প্রাণ এক করিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারিলে—তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখ, সর্ব্বপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা চিরতরে জুড়াইয়া যায়। তাঁহা হইতেই মহাশান্তি পরমানন্দ অধিগত হইয়া থাকে।

সেই সর্ব্বাতীত নিরঞ্জন ভগবান স্থান কালের অতীত। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্থান বা কালাকালের বিচার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানী সাধুগণ ও সৎশাস্ত্র-সমূহ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মানব যখন ব্যাকুলভাবে, দীপ্তশিরার ন্যায় অর্থাৎ—মস্তকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জীবের যে ভাব বা অবস্থা হয়, সেই ভাব বা অবস্থাপন্ন হইয়া, তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পিপাসু ও উৎসুক হয়, তখনই তাঁহার

অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। ধর্ম্ম সাধনায় ভগবানের অনুগ্রহ লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট বিধান। তদ্ব্যতীত স্থান কাল বা বাহ্য আশ্রম আচারের দ্বারা ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারা যায় না।

সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কেবল তিলক, মাল্য আদি ধারণ করিয়া বা বিশেষ বিশেষ আশ্রম অনুযায়ী বাহ্য বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের সেবা করে, তাহাদের ধর্ম্ম-সাধনা কোন কালেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহারা চিরদিনই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় যেমন তেমনই রহিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুগণ কোনকালেই তাহারা দমন করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ না হইলে প্রবল মানসিক গতি কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কেবল বাহ্য আচরণ ও অনুষ্ঠানে কখনই প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবানে প্রেম-ভক্তির উদয় হইতে পারে না।

তবে, যে ভাগ্যবান পূর্ব্বজন্মের সাধনা ও তপস্যার ফলে প্রথমাবধি প্রেম-ভক্তির অধিকার লাভ করে, সে জন্মাবধি ভগবানের ভক্ত হয়; তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি স্বতঃই প্রেমিক অনুরাগ হইয়া থাকে। সে জন্মাবধি একমাত্র ভগবানের আরাধনা উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই জানে না—সংসারের আর কিছুই তাহার ভাল লাগে না। এমন ভাগ্যবান মানবের দেহশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্য আর কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না।'

নানক এইরূপে বহুবাক্যে পিতার কথার প্রতিবাদ করিলেন। পিতা, তরুণবয়স্ক পুত্রের কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইলেন ও নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বালক পুত্রের মুখে এ কি অদ্ভুত কথা! যে পুত্র

আজিও বয়ঃক্রমে পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে নাই, যে পুত্র আজিও কোনরূপ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে নাই, তাহার মুখে এ সকল কি জ্ঞানপূর্ণ বাক্যসমূহ বিনির্গত হইল! পিতার প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল! তিনি নীরবে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষগণ জন্মাবধি এইরূপ অপূর্ব্ব অদ্ভুত ভাব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর বিশেষ শিক্ষা বা বয়ঃক্রমের কোনরূপ অপেক্ষা করে না।

জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পরপ্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধি কখনই প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা স্বতঃই পরম জ্ঞানের আধার। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিবার জন্ম সংসারে অবতীর্ণ হন। যখন সমাজ পাপ-তাপে পরিতপ্ত ও অজ্ঞান আঁধারে আচ্ছন্ন হয়, তখনই পতিত সমাজের উদ্ধারকল্পে তাঁহারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা পুরাতন বা পরকীয় পাপপন্থা গ্রহণ করেন না। নূতন পন্থায় নবভাবে নবধর্ম্মের প্রচার করেন। মহাপুরুষ নানক সেই ভাবে—সেই জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া নবধর্ম্মে পঞ্চনদ প্রদেশস্থ পতিত সমাজের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নানকের গার্হস্থ্য জীবন।

নানকের পিতা কালুবেদীর দিব্যচক্ষু এতদিনে উন্মীলিত হইল; তিনি অতি সুন্দররূপে বুঝিলেন যে, এ যে সে ছেলে নয়। তাঁহার এই পুত্র নিশ্চয়ই দৈবভাবে ভাবাপন্ন। এই পুত্র কখনই সামান্য সংসার-সুখে নিমগ্ন রহিবে না—এ পুত্র কখনই বিষয়-সম্পদসম্ভোগে নিরত হইবে না।

কালুবেদী অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যাহা ধরিতেন অথবা যাহা করিবেন বলিয়া একবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা সাধনা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। তিনি পুত্রের কথা শুনিয়া যদিও স্থির বুঝিলেন যে, তদীয় পুত্র কখনই সংসার লইয়া জীবনপাত করিবে না, তথাপি পুত্র যে তাঁহার বিপরীত মত অবম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না।

তিনি মনকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া পুত্রকে ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব করিয়া কহিলেন—নানক! তুমি যাহাই চিন্তা কর অথবা যাহাই ব্যক্ত কর, এখন তুমি কোনক্রমেই গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। যতদিন তোমার পিতা-মাতা আমরা জীবিত রহিব, ততকাল সংসারে অবস্থান করিয়া তোমার সংসার পালন করিতেই হইবে। তুমি সহজে আমার কথা গ্রাহ্য না করিলে, আমি বলপূর্ব্বক তোমার সংসারে অবস্থিতির ব্যবস্থা করিব জানিও। অতএব বালক হইয়া আর তুমি বিজ্ঞ বৃদ্ধের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করিও না। আমি যাহা বলি ও যেরূপ আদেশ করি, সেই ভাবে সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিতে থাক।

পিতার ক্রোধ ও বিরক্তি বুঝিয়া পিতৃভক্ত নানক আর অধিক বাক্যব্যয় করিলেন না। তিনি এক মনে নীরবে যেন কি অতি গূঢ় ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল সমগ্র সংসার যেন ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। জগতের সর্ব্বদিক সর্ব্বস্থলের অতি ক্ষীণ আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তামসিক ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া, অনন্ত—কালের করালগ্রাসে ডুবিয়া যাইতেছে।

পুত্র যে বিকট দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, পিতার চক্ষেও সেই দৃশ্য প্রতিভাত হইতে লাগিল। পিতার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—নানক! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর। আমি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখি—কোন্ কার্য্য উপযুক্ত, কি কর্ম্মে তুমি প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে সমর্থ হইবে, আমি বিশেষরূপে চিন্তা ও বিচার করিয়া যাহা স্থির করিব, সেইরূপই ব্যবস্থা করিব। তুমি তদনুসারে কার্য্য করিও।

পিতৃভক্ত নানক, পিতার কথায় প্রতিবাদ করিলেন না। পিতার বাক্যে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইলেন। পুত্রের সম্মতিবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

কালুবেদী তখনই পুত্রকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিনি পুত্রকে লবণের বাণিজ্যে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

কালুবেদী সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া একটি ভৃত্যের সহিত অর্থ দিয়া, পুত্রকে লবণ ক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নানক ভৃত্যের সহিত বন্দর অভিমুখে গমন করিলেন। উভয়ে যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক স্থানে সাধু-সন্ন্যাসী নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায়

অতিশয় কাতর হইয়াছেন। বাহ্য আকৃতি দেখিয়া নানক সহজেই তাঁহাদের অবস্থা বুঝিলেন।

সাধুগণের ভাব দেখিয়া নানকের কোমল হৃদয় সহজেই বিগলিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এই সাধুগণ অনাহারে থাকিয়া নিশ্চয়ই বড় কষ্ট পাইতেছেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা নিতান্তই অতিশয় ক্লেশকর। ইহাঁরা সাধু সন্ন্যাসী। ভগবানের চিন্তায় ইহাঁরা সদাই তন্ময়। ইহাঁদের দুর্দ্দশা মোচন করা গৃহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পিতা আমাকে ব্যবসায়ের জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এই অর্থ এখন আমারই হস্তগত। আমি যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে এই অর্থের ব্যবহার করিতে পারি। জীবের সেবায়, বিশেষতঃ সাধু-সজ্জনের সেবায় অর্থের ব্যবহার অপেক্ষা আর সৎ ব্যয় কি হইতে পারে ?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নানক, সাধুগণের সেবায় হস্তস্থিত অর্থ প্রয়োগই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন।

নানক ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন—'দেখ', পিতা ব্যবসায়ের জন্য আমাকে অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে এই অর্থ আমারই করায়ত্ত। আমি যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপেই ইহার ব্যবহার করিতে পারি।'

ভৃত্য, নানকের মনোভাব বুঝিল। সাধুগণের অবস্থা দেখিয়া নানকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছে এবং তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য অর্থ দান করিতে তাহার প্রাণে আগ্রহ জন্মিয়াছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিল।

নানকের মনের ভাব বুঝিয়া ভৃত্য কহিল—আপনার পিতা ব্যবসায়ের জন্য আপনাকে অর্থ প্রদান, করিয়াছেন। এ অর্থ আর অন্য কোন্ কারণে ব্যয় করিবেন ?

নানক কহিলেন—তুমি বুঝিয়া দেখ এই জীবন অতি অস্থায়ী অসার; তদ্রূপ অর্থও অতি তুচ্ছ দ্রব্য। ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কেবল 'দানে—জীব সেবায় ইহার ব্যয় করাই অর্থের যথার্থ সার্থকতা।'

ভৃত্য কহিল—'আপনি যাহা কহিলেন তাহা অতি সত্য; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আপনার পিতা লবণ ব্যবসায়ের জন্য এই অর্থ আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। যে জন্য তিনি এই অর্থ—আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য কারণে ইহা আপনি ব্যয় করিলে আপনার পিতা, আপনার প্রতি ও আমার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।'

নানক কহিলেন—তাহা সত্য! কিন্তু যে অর্থে জীবের জীবন রক্ষা না হয়, জীবসেবায় যে অর্থ ব্যয় না হয়, তাহার আর সার্থকতা কি? ভগবান বহু জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার মধ্যে মানব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানবের নিম্নস্তরে অবস্থিত যত জীব তাহারা সকলেই কেবল আপনার নিজ জীবন ও সন্তান রক্ষার জন্য ব্যগ্র। একমাত্র মানবই কেবল নিজ জীবন ও সন্তানের জীবন ব্যতীত স্বজাতীয় জীবের জীবন রক্ষার জন্য ইচ্ছুক হইয়া থাকে; ইহাই স্বভাবের নিয়ম—ভগবানের বিধান। এই নিয়মের—এই বিধানের বিপরীত কার্য্য করিলে পাপভাগী হইতে হয়। তাহাতে ভগবান কখনই রুষ্ট ব্যতীত পরিতুষ্ট হন না। ভগবান জীবের জীবন রক্ষার জন্য মনুষ্যের প্রাণে দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি সৎবৃত্তি-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়া, মৈত্রী প্রভৃতি ঐ সকল শ্রেষ্ঠবৃত্তি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রধান ভূষণ। যে হতভাগ্য মানব মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া, ঐ সকল উচ্চবৃত্তি অনুসারে কার্য্য না করে—তাহাদের সার্থকতা সাধনে অসমর্থ হয়, সে মানব-দেহে পশুর সমান। বৃথাই তাহার মানব জীবন ধারণ—মিথ্যাই তাহার

জীবন ভার বহন। তাহার উপর ভগবান নিশ্চয়ই বিরূপ হইয়া থাকেন। ভগবানের কৃপা লাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা। ভাবিয়া দেখ, এ জীবনের পরিমাণ কতটুকু। এ জীবন সত্যই জল বুদ্বুদের স্থায়; এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র —পরীক্ষা ক্ষেত্রে। সৎ ও শুভ কর্ম্ম দ্বারা সংসারের পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মানব-জীবন জলবুদ্বুদের স্থায় অসার ও ক্ষণস্থায়ী হইলেও, মানব-জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। বহু সৌভাগ্যের ফলে এমন জীবন লাভ জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠ মানব-জীবন লাভ করিয়া যে মানব, কর্ম্ম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে যত্ন না করে, তাহার জীবনের সার্থকতা কোথা? সে জীবন লাভের—সে জীবন বহনের ফল কি?'

তরুণ বয়স্ক নানকের মুখে গূঢ় তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া ভৃত্যের চিত্ত বিগলিত হইল। মহাপুরুষের বাক্যের এমনই প্রবল শক্তি।

ভৃত্য, আর নানকের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে নীরবে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। নানক হৃষ্টচিত্তে, সাধু-সন্ন্যাসিগণকে অর্থ প্রদান করিলেন ও বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—'মহাত্মগণ! দেখিলাম আপনারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। আমি গৃহী সংসারী। আপনাদের সেবা করাই গৃহিগণের পরম ধর্ম্ম। আপনাদের সেবার জন্য আমি এই সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

সাধুগণ, নানকের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ও বুঝিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, নানক যথার্থই হৃদয়ের মহৎভাবে প্রণোদিত হইয়াই তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিতেছে। তাঁহারা আনন্দিত মনে নানকের অর্থ গ্রহণ করিলেন।

নানক, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ভৃত্যসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি গৃহে আগমন করিয়া পিতার ভয়ে লুকাইয়া গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নানকের পিতা ভৃত্যের মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ও তীব্র ভাবে নানককে ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন। নানক নীরবে রহিলেন।

পিতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—তুমি কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নহ। কোনরূপ শ্রেষ্ঠ কার্য্যই তুমি সাধন করিতে পারিবে না। অতএব তুমি এখন হইতে অতি নীচ সামান্য গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হও। তুমি অদ্যাবধি নীচ ভৃত্যের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। গো-মহিষাদি চারণ করিতে থাক।

নানকের হৃদয় পরম পবিত্র ও উদার ছিল। তাঁহার সাম্যময় প্রাণ জগতের কোন কার্য্যকেই ছোট বা বড় বলিয়া বিবেচনা করিত না। বিশেষতঃ গো-মহিষাদি চারণে জীব-সেবার সার্থকতা ঘটিতে পারে মনে করিয়া তিনি আনন্দিত মনে পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

পরদিবস হইতে নানক গৃহের গো-মহিষাদি চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহের গো-মহিষাদি লইয়া চারণ-ক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় এক অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইল। একদা নানক গো-মহিষাদি চারণকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেন। তিনি গো-মহিষাদি ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে তাঁহার ক্লান্ত দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

নানক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। নানক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। প্রখর তপন তাপে তাঁহার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া উঠিল। তখন এক প্রকাণ্ড সর্প আসিয়া ফণা-বিস্তার

পূর্ব্বক তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সূর্য্যের উত্তাপ আর তাঁহার মুখে পড়িতে পারিল না।

নানকের গো-মহিষাদি চরিতে চরিতে এক কৃষকের শস্যক্ষেত্রে গমন করিল। তাহারা তথায় যাইয়া বহু শস্য ভক্ষণ ও অপচয় করিল। কিছুক্ষণ পরে ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে স্বীয় শস্যক্ষতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নানকের গো-মহিষাদি তাড়াইয়া লইয়া যেখানে নানক শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল।

একি অলৌকিক ব্যাপার! সামান্য মানব-বালকের মুখমণ্ডলের উপরিভাগে এক প্রকাণ্ড ভীষণ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! দেখিয়া কৃষকের প্রাণে অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হ'ল। কৃষক চিন্তা করিতে লাগিল—একি বিস্ময়কর কাণ্ড! এ বালক কি নরকুল-সম্ভূত! না—তাহা কখনই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না! মনুষ্য-বালকের মুখমণ্ডলে এরূপ কাল-ফণী ফণা বিস্তার করিয়া কেন সূর্য্যতাপ নিবারণ করিবে! এ বালক কখনই সামান্য মানবকুল-জাত নহে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কৃষক যেন জ্ঞানহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

সে আর কোন কথাই উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না। সে আর নানককে জাগরিত করিতেও সাহসী হইল না। কিছুদূরে রহিয়া একদৃষ্টে সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। এইরূপ স্তম্ভিতভাবে কিছুকাল রহিয়া সে ধীরে ধীরে নীরবে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কেবল যে নানকের জীবনে এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নহে। এইরূপ ঘটনার কাহিনী এতদ্দেশে বহু মহাপুরুষ সম্বন্ধে শ্রুত হইয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক সত্য ঘটনা কিনা—তাহা যাহারা স্বচক্ষে

প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারাই জানে এবং বিধাতা স্বয়ংই জানেন। তবে এরূপ একটা অসাধারণ অলৌকিক কথা কেন এদেশে শুনিতে পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন সহজে অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে।

এমন অলৌকিক ব্যাপার কি সত্য অথবা অলীক কল্পনার একটা প্রহেলিকা মাত্র? সে যাহাই হউক—সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক—এরূপ কিম্বদন্তী এদেশে বহু স্থানেই বহু মহাপুরুষ সম্বন্ধে শ্রুত হইয়া থাকে। বহু স্থানের বহু লোকের মুখে যাহা প্রকটিত, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। ফলতঃ ধর্ম্ম-জগতে অলৌকিক কাণ্ডের সংঘটন যে নিতান্ত অসম্ভব বা বিশ্বাস করিবার অযোগ্য, এমন কথাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, নানক যে ভগবানের অংশ বা অবতাররূপে বেদীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ জীবন-প্রভাবেই প্রকটিত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নানক গো-মহিষাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গো-মহিষাদি চারণ যে হেয় ঘৃণিত কার্য্য, তাহাতে নানকের মনে কোনরূপ দ্বিধা বা বিকৃতি ভাবের উদয় হইল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সাম্য অবস্থায় রহিয়া সুযোগ সুবিধা অনুসারে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনায় নিরত রহিলেন।

যতই দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নানকের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ মনে. করিলেন—নিশ্চয়ই নানকের চিত্ত-বিকৃতি ঘটিয়াছে। নানক উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা

সকলেই একবাক্যে নানকের পিতাকে, পুত্রের সুচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

কানুবেদী এতদিনে বুঝিলেন, পুত্র সত্যই বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছে। সত্বরই তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি জনৈক স্থানীয় চিকিৎসক আহ্বান করিলেন ও পুত্রের ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে কহিলেন।

নানকের পিতার অনুরোধে, বিজ্ঞ ও বিশেষ বিবেচক একজন স্থানীয় চিকিৎসক নানকের রোগপরীক্ষার জন্য আগমন করিলেন। নানকের পিতা, নানককে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু কেহই হঠাৎ তাঁহার সন্ধান বলিতে পারিল না।

উৎকণ্ঠিত হইয়া সকলে নানকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা দেখিলেন, বাটীর নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে নানক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র দেহ একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত।

নানক সেই অবস্থায় পরম সুখে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তখন নানক ভগবানের চিন্তায় এমনই তন্ময় ও আত্মহারা যে, কেহ যে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছে, সে জ্ঞানও তখন তাঁহার নাই। যিনি মহাশক্তি ও পরমানন্দের আধার, তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নানক মহাশান্তি-সুখ ও পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

চিকিৎসক নানকের নিকট আগমন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। নানক তখন মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহীন দশায় ছিলেন। তখন কে কাহার কথা শুনে—কে কাহার কথার উত্তর প্রদান করে? নানক নীরব নিস্তব্ধ। নির্ব্বাত স্থলে নিষ্কম্প দীপশিখা যেমন অতি

ধীর স্থির অবস্থায় থাকে, নানক তখন আপনাকে পরমব্রহ্মে লীন করিয়া তদবস্থায় রহিয়াছেন ।

চিকিৎসক, উচ্চৈঃস্বরে নানককে ডাকিতে লাগিলেন। সেই উচ্চশব্দে নানকের ধ্যানভঙ্গ হইল। চিকিৎসক, নানকের রোগ পরীক্ষার জন্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন।

নানক চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি আমায় কি পরীক্ষা করিবেন ?'

'আমি তোমার হস্ত দেখিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে চাই।'

নানক মৃদুহাস্যে কহিলেন—'আপনি কি পরীক্ষা করিবেন ? আমার বিষম রোগ কি আপনি পরীক্ষা করিতে পারিবেন ? এ যে কি রোগ, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি না। এ বিষম রোগে যথার্থই মানবকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। এ রোগ রোগগ্রস্তকে কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন গাওয়ায়, কখন নাচায়। এ যে হৃদয়ের রোগ।'

চিকিৎসক নানকের কথা ভাল বুঝিলেন না। তিনি মনে করিলেন নানক সত্যই বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নানকের পিতার অনুরোধ অনুসারে, কিছুদিন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

এ যে অতি অদ্ভুত অপূর্ব্ব রোগ! প্রকৃত ভক্তিরোগ যাহাকে একবার ধরে, তাহাকে যথার্থই উন্মত্তের ন্যায় করিয়া তুলে। সে নিজ আনন্দে সর্ব্বক্ষণ নিজে বিভোর হইয়া থাকে। সংসারের কোনই শোক, তাপ বা দুঃখ বিষাদ তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। ইহাই প্রকৃত মুক্তি—ইহাই মোক্ষানন্দ।

নানক বা তাঁহার তুল্য মহাপুরুষগণ যে আনন্দ উপভোগ করেন,

সাধারণ সামান্য সাংসারিক মনুষ্যগণ, তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। কাজেই সাধারণ ইতর ব্যক্তিগণ মহাপুরুষদিগকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

চিকিৎসকের চিকিৎসায় নানকের রোগ উপশম হইল না। তাঁহার রোগ যেমন তেমনি রহিল, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অতঃপর নানকের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সত্বর নানকের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার পিতা মাতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানকের পিতা মাতাও বুঝিলেন যে, পুত্রের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করাই একমাত্র ঔষধ। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কানুবেদী বুঝিলেন, সুন্দরী মনোহারিণী কামিনী মানবকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার পক্ষে একমাত্র দৃঢ় শৃঙ্খল। তাই তিনি নানাস্থানে সুন্দরী কন্যা অন্বেষণের জন্য ঘটক প্রেরণ করিলেন।

ঐ অঞ্চলে বটন নামে এক পরগণা ছিল। তথায় মৌনাযৌনা নামক একজন অতি সৎ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার সুলক্ষণ-সম্পন্না পরম সুন্দরী এক কন্যা ছিল। এই কন্যার সহিত নানকের বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইল।

বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া নানক মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি গোপনে লুক্কাইতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অনেকরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন।

নানক দেখিলেন, পিতা-মাতার যেরূপ একান্ত বাসনা ও অনুরোধ, তাহাতে যদি তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন, তবে পিতা-মাতার

প্রাণে দারুণ আঘাত প্রদান করা হইবে। পিতা মাতা সুখ-শান্তি লাভের জন্য পুত্র কামনা করেন। সেইজন্যই পুত্রকে লালন পালন করিতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই পুত্র উপযুক্ত হইয়া যদি পিতা-মাতাকে পরিতুষ্ট না করিয়া, তাঁহাদের দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হয়, তবে তাহার মত পাপী হতভাগ্য আর কে আছে ?

এইরূপ পিতা-মাতার কথা চিন্তা করিতে করিতে নানকের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পিতা-মাতার বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে নানকের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। নানক অগত্যা নিজ ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জানকী দেবী নাম্নী নানকের এক ভগিনী ছিলেন। তিনি নানককে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল জয়রাম। এই সময় দৌলত খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নানকের ভগিনীপতি জয়রাম দৌলত খাঁর অধীনে সেই অঞ্চলের একজন প্রধান তহশীলদার ছিলেন। জানকী নানককে বহুপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে পত্নীসহ গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নানকের ধর্ম্মজীবন।

নানক, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বুঝিলেন, সংসার-ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিতে হইলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। অর্থ ভিন্ন সংসারে দয়া-দানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি ভগিনী জানকী দেবীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ করিয়া উভয়ে যুক্তি করিলেন, এ অবস্থায় নানকের রাজ-সরকারে কোনরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, দান ও অপর ধর্ম্ম-ক্রিয়াদি ব্যাপারে নানক যেরূপ ব্যয়ে অভ্যস্ত, তাহাতে বিশেষ আয় ভিন্ন তাঁহার সে সকল ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া সুকঠিন।

জানকী দেবী স্বামী জয়রামকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া রাজসরকারে নানককে একটি কর্ম্ম প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজসরকারে জয়রামের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সত্বর নানককে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

চাকুরি হইতে নানকের অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। সেই অর্থ হইতে তিনি সামান্য অংশ দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ যাহা থাকিত, তাহা তিনি সাধু-সজ্জন ও দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। ফলতঃ নানক জানিতেন এবং ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যে অর্থ দ্বারা দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচন না হয়—অথবা যে অর্থে সাধুর সেবা না হয়, সেই অর্থের কোনই ফল নাই। উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও পুরীষতুল্য অপবিত্র।

তিনি উপদেশ দ্বারা সর্ব্বদাই অর্থের এই সার্থকতার কথা সকলকে বুঝাইতেন ও নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা মূঢ় অজ্ঞজনের চক্ষু উন্মিলীত করিয়া দিতেন! নানকের জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্তের এমনই প্রভাব ছিল যে, বহু হীন স্বভাব কৃপণ তাহা দেখিয়া আপনাদিগের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

মহাজনগণের উপদেশ ও জীবনের দৃষ্টান্ত প্রভাব এমনই প্রবল যে, তাহাতে অতি নীচ হেয়-স্বভাবও পরম পবিত্র ও সৎ হইয়া উঠে।

জীবনিবহের উন্নতি করাই বিধাতার মঙ্গলময় বিধান। সৃষ্ট পদার্থকে পবিত্র হইতে অধিকতর পবিত্র করা—সুন্দর হইতে সুন্দরতর করাই কল্যাণময় ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য। নতুবা জগৎ ব্যর্থ হয়—জগতের সৃজন উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি সাধন বহু প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মহাপুরুষগণের জগতে অবতরণ দ্বারা সংসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পবিত্র হয়; তাহাতেই সংসারের পাপ-মালিন্য সমধিকরূপে বিধৌত হইয়া যায়।

পঞ্জাব প্রদেশে সমাজ যখন নিতান্ত পতিত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তখনই নানক অবতীর্ণ হইয়া সৎ শুভ-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা তাহার উদ্ধার সাধন করেন।

নানক, পিতা মাতা ও ভগিনীর নিতান্ত অনুরোধে কিছুকালের জন্য গৃহ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি কখনই গৃহব্যাপারে আসক্ত হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই পদ্ম-পত্রস্থ জল-বিন্দুর ন্যায় সংসার-বন্ধন হইতে অনাসক্ত ভাবে রহিতেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ অনুসারে

এই সময়ে তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের একটির নাম শ্রীচন্দ ও অপরটির নাম লক্ষ্মীদাস।

যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নানক ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এ কি হইল, এই কি জীবনের চরম পরিণতি! এমন যে মনুষ্য জীবন লাভ করিলাম, তাহার কি এই সাধনা? এইরূপে কি তাহার সার্থকতা? আমি যতই সংসারের মোহ-মদিরা পান করিতেছি, ততই উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছি। আমি কেন এমন দুর্ল্লভ জন্ম, দুর্ল্লভ জীবন লাভ করিলাম।

অপর সকল জন্ম—সকল জীবন কেবল মাত্র তুচ্ছ ভোগের জন্য। একমাত্র মানব-জীবনই কেবল কর্ম্মের জন্য। মানব-জীবনের কর্ম্ম কি? ধর্ম্মসাধনই একমাত্র মানব-জীবনের সার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সকল ছাড়িয়া, সকল ভুলিয়া, ভগবানে দেহ মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার ভজন সাধন করিলেই এই অতি অসার অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সার্থকতা হইয়া থাকে—তাহাতেই প্রকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়; কিন্তু আমি এ কি করিতেছি? এমন জীবন-লাভের কি সার্থকতা সাধন করিলাম? এ জীবন দিন দিন দৃঢ় সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে। ক্রমে মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইতেছি। এখন উপায় কি? এ দৃঢ় বন্ধন ছেদনের অস্ত্র কোথা? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিবেক-বৈরাগ্যের তীব্র তাড়নায় নানক নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। নানক যখন ভগবানে ভক্তিভাবে বিভোর হইতেন, তখন তিনি সংসারের সকল বিষয়, সকল কর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। তখন বাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট প্রলয়ের গর্ভে লীন হইয়া যাইত।

এমন ভক্ত মহাপুরুষ কতকাল বিষয়-ব্যাপারে বিমুগ্ধ থাকিতে পারেন? কতকাল তিনি সামান্য কর্ম্মে নিবদ্ধ রহিবেন? সরকারী

কর্ম্মে তাঁহার ক্রমেই শৈথিল্য পড়িতে লাগিল। নানক কিছুকাল পরেই কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

নানক গৃহে বসিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন রহিতেন, তখন তাঁহার আর সংসারের জন্য কোনই ভাবনা থাকিত না। স্ত্রী-পুত্রগণ কি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে, তাহা তাঁহার প্রাণে একেবারেই উদিত হইত না।

ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব প্রভাব? ভগবানের কি অদ্ভুত মহিমা! কোথা হইতে কিরূপে যে নানকের সংসার নির্ব্বাহ হইত, তাহা তিনিও জানিতেন না—অপরেও বুঝিতে পারিত না। যেমন তিমি মৎস্য সামান্য ক্ষুদ্র জলাশয়ে থাকিতে পারে না, তেমনি মহানুভবগণ কখনই সামন্য সংসার ব্যাপারে নিমগ্ন থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অগাধ অসীম ব্রহ্ম-সাগরে সন্তরণ করিতেই ভাল বাসেন। ভগবান যেন স্বয়ং তাঁহাদিগের সঙ্গে বিহার করিতে—তাঁহাদিগকে লইয়া লীলা করিতে ভাল বাসেন। তাই ভক্ত মহাপুরুষগণের সকল ভার ভগবান স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন।

সংসারে বৈরাগ্য ও একান্ত ঔদাসীন্য দেখিয়া নানকের আত্মীয়-স্বজনগণ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। নানক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, তদুপরি তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কি উপায়ে তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে, তাঁহারা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিলেন—নানককে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা কি উপায়ে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে?

এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা নানকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—'দেখ নানক! তুমি এখনও বৃদ্ধ হও নাই। ধর্ম্ম সাধনের

কাল এখনও তোমার অতিবাহিত হয় নাই। বিশেষতঃ তুমি পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তদুপরি সন্তান সন্ততির পিতা হইয়াছ। তাহাদিগের রক্ষণ ও পালন করাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে তাহা' তোমার ধর্ম্ম। গৃহধর্ম্ম ও সংসার আশ্রমের নিয়ম পালন করাই তোমার ন্যায় গৃহী ও উপযুক্ত ব্যক্তির একান্ত বিধেয়। তুমি সংসার আশ্রমের বিধান প্রতিপালন না করিলে কে তোমার স্ত্রী-পুত্রগণকে প্রতিপালন করিবে; তাহারা প্রতিপালিত না হইয়া যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তবে তজ্জন্য কে পাপভাগী হইবে—কে ভগবানের নিকট দায়ী হইবে?

আত্মীয়-স্বজনগণের কথায় নানক বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। পরে মৃদুহাস্যে কহিলেন—আপনারা আমায় কি বলিতেছেন? কে কাহার ভার গ্রহণ করিতে পারে? কে কাহাকে প্রতিপালন করে? একমাত্র ভগবান সকলের কর্ত্তা। কেবল তিনিই সকলকে পালন ও রক্ষা করেন; তিনি প্রতিপালন না করিলে—রক্ষা না করিলে, কোন্ জীব আপনাকে বা আপনার সন্তান সন্ততিকে রক্ষা করিতে পারে? একমাত্র ভগবানই সকল শক্তির মূল—সকলের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোনই ভয় —কোনরূপ ভাবনা থাকে না। যদি তিনি কৃপা করেন, তবেই জীবের জীবন রক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন কে কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাহার এমন শক্তি আছে যে, নিজের বা অপরের প্রাণের ভার লইতে পারে? একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ভাবিয়া দেখুন কি অপার মহিমা—কি অদ্ভুত শক্তি সেই মহামহিমময় সর্ব্বশক্তিমানের? যাঁহার আদেশে মহাকাশে চন্দ্র সূর্য্য সমুদিত হইয়া জীবলোকে আলোক দান করিতেছে—যাঁহার ইচ্ছায় জীবের জীবন রক্ষার জন্য বাতাস

বহিতেছে—সলিল রাশি প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার কি শক্তি কি মহিমা! যিনি এই অসীম অনন্ত বিশ্বরাজ্য সৃজন করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার মহিমা মাহাত্ম্যের কণামাত্র অবগত হইয়া, কোন্ হতভাগ্য মূঢ় আপনার বা স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন ভয়ে ভীত হইয়া থাকে?'

যাহারা নানককে সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা অতি অন্ধ সংসার-কীট। তাহারা নানকের কথার কোনই সৎ বা সার ভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা মনে করিল যথার্থ ই নানকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া বিজ্ঞ-সংসারী জনের ন্যায় তাহারা নানককে অসৎ অনুপযুক্ত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সৎ ও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য বহু ভাবে, বহু প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। সেই অজ্ঞ মূঢ়গণ পরকাল কি অনন্ত কালের প্রকৃত তত্ত্ব কি—এই জীবনের পরিণাম কি—এ সকল গূঢ়তত্ত্ব আদৌ বুঝিতে পারিত না—ধারণাও করিতে পারিত না। তাহারা মহামতি পরম ভক্ত নানককে কেবল সংসার প্রতিপালনের জন্য উপদেশ দিতে লাগিল।

নানক বিরক্ত ভাবে কহিলেন—আপনারা সংসারে এত দেখিলেন শুনিলেন, তাহাতেও কি বুঝিলেন না যে, কোন বিষয়ই মনুষ্যের স্বীয় করায়ত্ত নহে। যদি ইচ্ছা করিলেই কেহ ধনে মানে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত, তবে সংসারে কে দীনহীন হইয়া থাকিত? সকলেই বড় হইতে চায়। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন বড় হইতে পারে? বহু ব্যক্তি সংসারে দরিদ্রের গৃহে অতি দুরাবস্থায় নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে। অতি কম লোকই ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন সম্পদের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। সে সুখ কিন্তু প্রকৃত

সুখ নহে। জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী—জীবনের ভোগজনিত সুখ সম্ভোগও তেমনি অতি অসারও অল্পস্থায়ী। সে সুখ, অল্পক্ষণের জন্য অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে, লাভ হইলেও অতি অল্প সময়ের জন্য ভোগ হইয়া থাকে, আবার যখন সে সুখ অল্পকাল রহিয়া চলিয়া যায়, তখন নিতান্ত অবসাদ ও দুঃখ প্রদান করিয়াই প্রস্থান করে। যাহাতে অনন্ত সুখ—যে সুখের শেষ নাই—ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমভক্তিজনিত যে সুখ, বুদ্ধিমান চতুর মনুষ্যের পক্ষে সেই কৈবল্যলাভের চেষ্টা করাই বিধেয়। তদ্ভিন্ন অন্যরূপ দেহ ইন্দ্রিয় সহ বাহ্য জড়-জগতের সম্মিলনে যে সুখ সমুদ্ভূত হয়, তাহা অতি তুচ্ছ নীচ সুখ। তুচ্ছ নীচ জনেই সেই সুখ-সম্ভোগের আশা করে—সেই সুখের আশায় প্রধাবিত হয়। মৃগ যেমন জলভ্রমে মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকার প্রতি ছুটাছুটি করে, সেইরূপ অন্ধ মূঢ় দীনহীন ইতর মানব সুখশান্তির আশায় বৃথাই সংসারে ঘুরিয়া মরে। কি শোচনীয় সেই হতভাগ্য মানবের দুর্দ্দশা!

নানকের এইরূপ গূঢ় তত্ত্বকথা তাহাদের কর্ণে স্পর্শ করিল না। কর্ণে যাইলেও তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। তাহারা সেই একই কথা বারম্বার নানককে কহিতে লাগিল।

নানক তখন বিনীত-কণ্ঠে কহিলেন—'দেখুন, আমি অতি তুচ্ছ। আমার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র মনও ক্ষুদ্র। এতই ক্ষুদ্র যে, আমি একই কালে ভগবানের কথা এবং বিষয়ের কথা ভাবনা করিতে পারি না। বিষয়-চিন্তা ও ভগবানের কথা চিন্তা—এই উভয় চিন্তার মধ্যে একমাত্র ভগবানের কথা চিন্তা করাই শ্রেয়। কারণ—একমাত্র তাহাতেই পরকালের মঙ্গল। কেবল পরকালেরই বা—বলি কেন? তাহাতে ইহকাল পরকাল উভয় কালেই কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়। ঈশ্বর ধ্যানে, ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানে প্রাণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ঘুচিয়া যায়।

তাহাতেই প্রকৃত শান্তি অধিগত হইয়া থাকে। যে হতভাগ্য মানব ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা ভগবানে সংযুক্ত বা আসক্ত হইতে না পারে, তাহার প্রকৃত বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় না। বিবেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তির প্রাণে কখনই যথার্থ শান্তি জন্মে না। শান্তিহীন চঞ্চল প্রাণে স্থখের আশা আকাশ-কুস্থমের ন্যায় একান্তই অসম্ভব। আমার একান্ত প্রার্থনা আর আপনারা আমাকে বিষয়-ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন না।'

যে সকল আত্মীয়-স্বজনগণ নানককে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তি কহিল—'তুমি গৃহী সংসারী ব্যক্তি। তোমার গৃহে একান্ত প্রতিপাল্য স্ত্রী-পুত্রাদি বিদ্যমান। কে তাহাদিগকে প্রতিপালক করিবে? তুমি যদি ঈশ্বরকে ভজন-সাধন করিবার জন্য গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, তবে কে তাহা-দিগকে প্রতিপালন করিবে—কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে?

অজ্ঞের কথা শুনিয়া নানক অতি গম্ভীর ভাবে মৃদু হাস্য করিলেন। ক্ষণকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে রহিলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝড়িতে লাগিল। তিনি সংজ্ঞাহীন সমাধিস্থ হইলেন।

এই অপূর্ব্ব অবস্থার ভাব তাহারা বুঝিল না। তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নীরবে রহিল। কিছুপরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে নানক কহিলেন— 'কে কাহার পুত্র? কে কাহার পত্নী? কে কাহার জন্য ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারে? পারে কেবল সেই একজন। জীবের জগতে আসিবার পূর্ব্বে যিনি মাতৃগর্ভে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, তিনিই জীবের ভার বহন করেন, তিনিই তাহার আহারের ব্যবস্থা করেন। সামান্য

মনুষ্য ভাবিয়া কাহার জন্য কি করিতে পারে? মানব কি ভ্রান্ত মূঢ়! সে অহঙ্কারের বশে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে যে, সে আপনি আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না।'

এই বলিয়া নানক নীরব হইলেন। যাঁহারা অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নানককে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিল ও একে একে সকলে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধির পথে নানক।

নানক ক্রমেই ভগবানের ধ্যানে এতই আত্মহারা হইলেন যে, তিনি সংসার-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে থাকিয়া ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নানকের পিতা মাতা পুত্রের সেই ভাব দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, নানক সত্যই উন্মত্ত হইয়াছে। তখন নানককে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার পিতা অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে কহিলেন—'নানক! তুমি ব্যবসা করিতে পারিলে না—রাজ-সরকারেও কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে। এক্ষণে একটি কর্ম্ম কর। দেখ—আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনে আমি

অক্ষম। তুমি আমাদিগের একমাত্র আশা-ভরসা স্থল। আমাদিগের কৃষিক্ষেত্রে তুমি কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত হও। তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় হইবে।

পিতার কথা শুনিয়া নানক কহিলেন—পিত! এক্ষণে আমি এক অতি উত্তম শস্যক্ষেত্র লাভ করিয়াছি। তাহাতে নিত্য নূতন নূতন মনোহর শস্য অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে। আমি এক্ষণে সেই শস্যক্ষেত্রের কৃষির জন্য বড়ই ব্যগ্র ও যত্নবান রহিয়াছি। আমি এখন আর অন্য শস্যক্ষেত্রে মন দিতে পারিব না।

পুত্রের কথা শুনিয়া পিতা বড় বিরক্ত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—'তুমি সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় ওরূপ মিথ্যা প্রলাপ-বাক্য ব্যবহার কর কেন? কোথায় তুমি নূতন শস্যক্ষেত্র পাইলে? আর এরূপ মিথ্যা প্রলাপ-বাক্য বলিও না। আমাদের শস্যক্ষেত্র আছে। যত্ন করিয়া সেই সকল ক্ষেত্র কর্ষণ কর, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন হইবে।'

নানক কহিলেন,—'পিতঃ! আমার চিত্ত সাধু সহবাসে কৃষক হইয়াছে। আমার জীবনই শস্যক্ষেত্র। সৎকর্ম্মই লাঙ্গল। সেই লাঙ্গল সর্ব্বদা জীবনরূপ কৃষিক্ষেত্রকে কর্ষণ করিতেছে। অনুরাগ-সলিল আমার সেই শস্যক্ষেত্র সর্ব্বদা সেচন করিতেছে। ভগবানের নাম সেই ক্ষেত্রের বীজ। সন্তোষ সেই ক্ষেত্রে মই তুল্য হইয়াছে। সেই মইদ্বারা ক্ষেত্রের উচ্চ-নীচ স্থান সকল সমান করিতেছি। তাহাতেই আমাকে এই দীনহীন কাঙালের বেশ ধারণ করাইয়াছে। ভক্তিরূপ সুধা সমগ্র কৃষি কার্য্যকে এক করিয়া তুলিয়াছে। ভগবান আমাকে দয়া করিয়াছেন এবং আমাকে আপনার নিরাকার নির্ব্বিকার-শূন্য স্থান দান করিয়াছেন।'

নানকের কথা তাঁহার পিতার নিকট বিষম রহস্যময় প্রহেলিকা স্বরূপ বোধ হইল। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন নানকের বোধ হয় কৃষিকর্ম্মে ইচ্ছা নাই। এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন —'নানক! যদি কৃষিকার্য্য তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে তুমি একখানি দোকান করিয়া ব্যবসা কার্য্যে নিযুক্ত হও।'

নানক প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—'আমি ব্যবসায়ের' দোকান খুলিয়াছি। আমার মন তাহাতে ভাণ্ডার তুল্য হইয়াছে। ভগবানের নামরূপ মহারত্ন সেই ভাণ্ডারে রক্ষিত হইতেছে। সাধু-সজ্জনগণের সহিত আমার সর্ব্বদাই কারবার চলিতেছে। এই ব্যবসায়ে আমি অত্যন্ত লাভবান হইতেছি।'

নানকের পিতা তাহাতে বুঝিলেন, নানকের ব্যবসায়ে ইচ্ছা নাই। তিনি কহিলেন,—'নানক! তুমি কৃষিকার্য্যে অক্ষম, ব্যবসা করিতেও অসমর্থ। তবে তুমি একটি কর্ম্ম গ্রহণ কর।'

নানক কহিলেন,—পিতঃ! আমি যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি— আমি ভগবানের দাস হইয়াছি। তাঁহারই নাম জপ করিয়া কাল কর্ত্তন করিতেছি। যদি সেই নিরাকার নির্ব্বিকার প্রভু আমাকে দয়া করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

ক্রমে নানক ভগবৎ ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি আর গৃহে রহিতে পারিলেন না। তিনি ধর্ম্মের গূঢ়-তত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তজ্জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

নানক বুঝিলেন, গৃহে আবদ্ধ থাকিলে প্রকৃত সাধন হইবে না।

ভগবান যেন তাঁহার মস্তকে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মই ভগবানের নিজ বিধান, নিজ কার্য্য। সেই বিধানমত কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে মহাজনগণকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। নানক ভগবানেরই প্রেরিত সেই মহাপুরুষ। তিনি ভগবানের কার্য্য সাধন ব্যতীত কখনও অন্য সামান্য সাংসারিক কার্য্যে আবদ্ধ রহিতে পারেন না। যিনি যতই চেষ্টা করুন, কেহই কখন নানকের ন্যায় মহাপুরুষকে সামান্য গৃহকর্ম্মে আসক্ত বা আবদ্ধ রাখিতে পারেন না।

নানকের গৃহ-সংসার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। বিবেক-বহ্নি তাঁহার মস্তকে দাউ দাউ জ্বলিতে লাগিল। নানক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। গৃহ-ত্যাগ করিয়া, পারিব্রজ্যপন্থায় প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময়ে নানকের মনে একটা অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হইল। নানকের প্রাণ, পিতা মাতা পত্নী ও পুত্রাদির জন্য ক্ষণতরে বিচলিত হইয়া উঠিল।

নিশীথ সময়ে নানক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিদ্রা লাভ করিতে পারিতেছেন না। এক একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই পুত্র কন্যা পিতা মাতা আমার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমি এই অবস্থায় যদি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করি ও গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি, তবে ইহাদের উপায় কি হইবে?

নানক শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। আর শয়ন করিয়া রহিতে পারিলেন না। মায়ার কি অদ্ভুত মোহ-মদিরা! কি অপূর্ব্ব লীলা

খেলা! মায়ার মোহ-মদিরায় আকৃষ্ট হইয়া জীব, ভীষণ সংসার-চক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে। সে ভীম-চক্র হইতে তাহার উদ্ধারের পথ দেখিবার উপায় নাই।

মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের মদমত্ত ঐরাবত তুল্য। কোন বন্ধনই তাঁহাদিগকে অধিককাল আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাঁহারা সহজেই মায়া-মোহের অপর সর্ব্ববিধ বাহুর বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের বিবেক-বহ্নি সকল বন্ধন নিমেষে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

ক্ষণ পরেই নানকের বিবেক-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, মোহের বন্ধন দগ্ধ করিয়া ফেলিল। নানক আপনমনে আপনি কহিলেন আমি কে? কে আমার? স্ত্রী পুত্রাদি সকলই তো মহা ভ্রমময় মায়ার ছায়া মাত্র। ভগবানকে ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া কি চিরজীবন পাপতাপময় সংসার-মায়ায় আবদ্ধ রহিব?

নানক বেগে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তিনি আর কোন দিকেই দৃক্‌পাত করিলেন না। গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নানক সন্ন্যাসী হইয়া—সংসারের সকল ছাড়িয়া, সকল ভুলিয়া একান্ত মনে প্রস্থান করিলেন।

এই অবস্থায় নানক দেশ বিদেশ নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নানক ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া মুসলমানের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রসিদ্ধ মক্কা নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

নানক যতই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—যতই নানারূপ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, ততই ধর্ম্ম-বিপ্লব দেখিয়া হতাশ হইতে লাগিলেন।

নানক দেখিলেন, সংসারের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য ভাণ বা আড়ম্বর মাত্র রহিয়াছে। কোথাও কোন ধর্ম্মেই প্রকৃত সারভাব নাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মই কেবল ভণ্ডামির ভাবে পরিপূর্ণ। ভগবানে প্রকৃত ভক্তি বা বিশ্বাস কোন ধর্ম্মে বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কেবলই ভণ্ডামি, আর ভণ্ডামির ক্রিয়া-কাণ্ড ও জনসাধারণকে ভুলাইবার ভাণ মাত্র।

একদা নানক মক্কায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

শয়ন অবস্থায় নানকের পদদ্বয় মক্কার মস্‌জিদের দিকে নিপতিত হইয়াছিল। একজন মুসলমান ফকির নানকের সেই অবস্থা দর্শন করিল। নানকের সেই অবস্থায় পদরক্ষা দেখিয়া সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ফকির তীব্র কণ্ঠে নানককে নানারূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিল; সে কহিল,—'অরে দুষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট কাফের! তোর কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই?'

নানক বিনীত কণ্ঠে কহিলেন,—"কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

ফকির কহিল,—'তোর অপরাধের সীমা নাই। তুই অতি হতভাগ্য নরাধম। তুই ঘোর অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের মস্‌জিদের দিকে পদ স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছিস্? দেখিতেছি তোর লজ্জাও নাই ভয়ও নাই।'

ফকিরের কথা শুনিয়া নানক কহিলেন,—'ভাই ফকির সাহেব।

তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা কর। আমি অজ্ঞান, অতএব তোমার দয়ার পাত্র।

নানক যতই কাকুতি মিনতি করিয়া ফকিরকে কহিতে লাগিলেন, সে ততই উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে তীব্রভাবে তাড়না করিতে লাগিল। অবশেষে নানক কহিলেন,—'ফকির! তুমি বলিতেছ আমি পা দুখানি ভগবানের মস্‌জিদের দিকে রাখিয়াছি, এই আমার অপরাধ। তোমায় আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি আমার পদদ্বয় এমন স্থানে রাখিয়া দাও যেখানে ভগবান নাই।

নানকের কথায় ফকির স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুকাল ভাবিয়া সে নানকের কথার সত্যতা ও সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল। সে বুঝিল, নিরাকার ভগবান তো কতই অসীম অনন্ত। তিনি অনন্ত অসীম স্থান ব্যাপ্ত করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আবার আদি বা অন্ত কোথায়? তিনি বিদ্যমান নাই এমন স্থানই বা কোথায়?

নানকের কথায় ফকিরের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল। ফকির আপনার বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে আর কোন কথাই কহিল না। নীরবে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

নানকের গৃহ ত্যাঁগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী ও ভগিনীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার গৃহত্যাগে বাধা দিয়াছিলেন। নানকের ভগিনী জানকী দেবী নানককে নানারূপে নানা কথায় বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ভেদী রোদন, তাঁহার নানারূপ বাক্য কোনই ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। প্রবল স্রোতের গতি কখনই সামান্য বালির বন্ধনে নিরুদ্ধ থাকিতে পারে না।

নানককে কেহই গৃহ সংসারে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারিল না। নানক আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ধর্ম্মের গ্লানি সন্দর্শন করিয়া নানকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান আর কোথাও নাই। প্রকৃতই জ্ঞান ও ভক্তি যেন চিরতরে মানব-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। চারিদিকে ধর্ম্মের নামে কেবল ভণ্ডামি আর বাহ্য আড়ম্বর। সমুদয় সংসার ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন—সমগ্র মানব-সমাজ পশু-সমাজে পরিণত। সর্ব্বদিকে কেবল ঘোর নাস্তিকতা আর বিলাসিতা।

নানকের ভগবদ্ভক্ত প্রাণ মানব-সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর কিরূপে গৃহে স্থির থাকিবেন ?

নানক, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যে সকল পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সাধু-সজ্জনগণ আগমন করেন, সেই সেই তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

নানকের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, চিত্তের সংযম দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র করিয়া, সেই হৃদয়ে ভক্তি-চন্দন পুষ্পে বিভূষিত করিয়া, ভগবানকে একান্ত প্রাণে অর্পণ করাই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। সেই ভাব মানব-সমাজ মধ্যে আনয়ন করিতে পারিলে, পতিত সমাজের উদ্ধার সাধন হইতে পারে ; নতুবা তাহার উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই।

নানক প্রথমাবধি বুঝিয়াছিলেন যে, মানব মাত্রেই একই ভগবানের সৃষ্ট জীব। তাহারা সকলেই তাঁহার সন্তান স্বরূপ—সকলেই সকলের ভ্রাতা। সকলে সম্মিলিত হইয়া একই মনে, একই প্রাণে তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য এবং তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

নানক যখন পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন এদেশে মুসলমানরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মও এদেশে প্রবল হইয়া উঠে। তজ্জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একপ্রকার ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া নানক বড়ই ব্যথিত হইলেন। যাহাতে এই ভাব বিদূরিত হইয়া, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব জন্মে, তিনি তজ্জন্য ব্যগ্র ও সচেষ্ট ছিলেন। এইজন্য তিনি ইসলামের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই মুসলমানের প্রধান তীর্থক্ষেত্র মক্কায় গমন করিয়াছিলেন।

বহু ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া, তিনি ধর্ম্ম সমন্বয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতি বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর ভক্তি ও প্রেম-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার ধর্ম্ম উপদেশ যে শুনিতে লাগিল, তাহারই হৃদয় বিগলিত হইল। জীবনের ও জগতের অলীকত্ব অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া নানক বুঝাইতে লাগিলেন, সকলই অস্থায়ী অসার, অসত্য, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তা ভগবানই সত্য। প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, জগতের জীবনের ভোগ-বাসনা ও সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় সুখ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নানকের ধর্ম্ম-কথা, তত্ত্ব-উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে জনৈক অজ্ঞ মূঢ় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'যাহা পরিষ্কার জ্ঞান বুদ্ধিতে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা অলীক মিথ্যা, আর যাহা কখন স্বচক্ষে দেখি না, যাহার কথা স্বকর্ণে শুনিতে পাই না, তাহা সত্য, একথা মানিব কেন?'

নানক কহিলেন,—'হে মূঢ় অন্ধ মানব! তুমি ঘোর অজ্ঞানের

মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তজ্জন্য তোমার দিব্য দৃষ্টি, বিশুদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধি এক্ষণে বিলুপ্ত। জীব যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন সে স্বপ্নদৃষ্ট যাহা কিছু তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া থাকে। যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, স্বপ্ন-মোহ বিদূরিত হয়, তখন সত্যদৃষ্টি দ্বারা সত্য জগৎ প্রত্যক্ষ করে ও তাহাকেই সত্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তেমনি মূঢ় মানব সতত অন্ধ জ্ঞানে, অন্ধ দৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, সাধারণতঃ যাহা অনুভব করে, তাহাই প্রকৃত সত্য বলিয়া অবধারণ করে, পরে যখন সে সাধন সৌভাগ্যের ফলে ভগবানের কৃপালাভ করে ও তজ্জন্য তাহার ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুচিয়া যায়, তখন সে জানিতে পারে এ জগতের জীবনের বাহ্য ব্যাপার সকলই মিথ্যা, একমাত্র ভগবানই সত্য, আর তাঁহার প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, ভক্তি পূজার অনুষ্ঠানই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।'

সে কহিল,—'সত্য হইলেও সে কথা মানিয়া লাভ কি? তাহাতে কোন্ ফল পাওয়া যাইতে পারে?'

নানক কহিলেন,—'একথা বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। সাধারণ মানব ইন্দ্রিয়-ভোগজনিত সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহা কিন্তু নিতান্তই ভ্রম। বিচারে বেশ বুঝা যায় যে, দেহেন্দ্রিয়-ভোগের সুখ কখনই প্রকৃত সুখ নহে। সে সুখ অতি অসার অস্থায়ী। সে সুখ অর্জ্জনে প্রথমে দুঃখ, শেষে বিসর্জ্জনেও ঘোর অবসাদ মহাদুঃখ। এমন যে ক্ষণিক অল্পস্থায়ী দুঃখ-সুখ, তাহা কখন প্রকৃত বলিয়া সত্য হইতে পারে না। এখন ভাবিয়া দেখ প্রকৃত সুখ কি? তাহার স্বরূপই বা কেমন? যে সুখের আদিতে, মধ্যে বা শেষে কখনই দুঃখ বিষাদের লেশমাত্র নাই, সেই স্থায়ী সুখই প্রকৃত, সেই সুখের নাম

আনন্দ। এই আনন্দ লাভই মানব-জীবনের চরম মুখ্য উদ্দেশ্য। একমাত্র ভগবানই সেই পরমানন্দের আধার। সেইজন্যই তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ। সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, জড়-জগতের অন্য কোনদিকে বা জীবনের অন্য কোন ভাবে যে সুখের আশা—সে কেবল বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। সংসারে অধিকাংশ মানবই তো সমুদয় জীবন সুখের আশায় ঘুরিয়া মরে; কিন্তু কোন মানবই সুখের মুখ দেখিতে পায় না; চিরজীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে জীবন যাপন করে; তখন মূঢ়-মানব অনুতপ্ত প্রাণে ক্রন্দন করে—হায় হায়! এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম মানবজীবন লাভ করিয়া কি করিলাম! এইরূপ অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইয়া তাহার পাপতাপের উপকরণ ভস্মীভূত হইলে সে বুঝিতে পারে, জগতের সকলই তুচ্ছ অসার, দুঃখ-বিড়ম্বনার আলয়, একমাত্র ভগবানই আনন্দের আধার—তিনিই সত্যের আলোক। এই গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে অবলম্বন কর—তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর।'

নানকের এইরূপ বহু তত্ত্ব-কথা, গূঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া বহু মানব বিমোহিত হইল। তাঁহার কথায় অতি কঠোর পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইতে লাগিল। বহুলোক দলে দলে আসিয়া, তাঁহার কথা হৃদয়ের আগ্রহে শ্রবণ করিতে লাগিল। এমন কি সমাজের অতি অপকৃষ্ট ইতর শ্রেণীর লোক সমূহেরও মতিগতি নানকের ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অনেক নরনারী কেহ বা প্রকাশ্যে, কেহ বা গোপনে তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নানকের শিষ্য-সংগ্রহ।

জ্ঞানভক্তির প্রকট মূর্ত্তিস্বরূপ মহামতি নানকের নাম, যশ চতুর্দ্দিকে অতি সত্বরই প্রচারিত হইয়া পড়িল। মুসলমান শাসনকর্ত্তা সে কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন।

প্রবল অগ্নি কতক্ষণ ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে? তাহার প্রচণ্ড প্রভা সত্বরই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই সামান্য ব্যক্তি নানক এখন অতি উজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিক প্রকটিত হইলেন ও বহু স্থানে মহাপুরুষরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। কালুবেদীর পুত্র নানক, যে কিছুকাল পূর্ব্বে মাঠে গো-মহিষাদি চরাইত, সামান্য মুদি দোকান চালাইত, তাহার এত প্রভাব! তিলওয়ান্দী অঞ্চলবাসী বিস্মিত নেত্রে মহাপুরুষ নানকের পানে চাহিয়া বিমুগ্ধ হইল।

যেখানে সেখানে, যখন তখন, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালেই মহাপুরুষ নানকের কথা আলোচনা হইতে লাগিল। কেন এমন আলোচনা—কিজন্য এত আন্দোলন? এ প্রভাব প্রতিপত্তি কেন? এ যে ধর্ম্মের প্রভাব—জ্ঞান-ভক্তিজনিত প্রতিপত্তি। মূলে প্রকৃত বিশ্বাস—দৃঢ় অটল থাকিলে, এই ধর্ম্মের উত্থান ব্যতীত পতন কখনই ঘটিতে পারে না।

নানকের প্রতিষ্ঠা—ভগবানের প্রসাদ। এই প্রসাদের ধ্বংস সাধন করিতে পারে, এমন শক্তি জগতে কোথা? ইহা যে সামান্য জড়-জগতের অতীত সামগ্রী।

নানকের অলৌকিক ধর্ম্ম প্রতিভা দাউ দাউ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি সেই দিব্য স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। যাহারা সে আলোকের দিব্য জ্যোতি লাভ করিল,

তাহারা উভয়ের বিদ্বেষ ভাব বিস্মৃত হইল। সকলেই পরম মৈত্রী ও সাম্য ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমান যেন, দিন দিন দুই ভাই এমনই ভাবে সংগঠিত হইয়া উঠিল। এই সময় অনেক মুসলমান নানকের শিষ্য হইতে লাগিল।

মুসলমান বাদসাহ এই কথা শুনিলেন; শুনিয়া তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কি? দুষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট কাফেরের এত স্পর্দ্ধা! পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানকে সে মহা অপবিত্র ধর্ম্মে পতিত করিতেছে?

বাদশাহ, নানককে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজ আদেশ বাহির হইবা মাত্র নানক বন্দী হইয়া বাদশাহের নিকটে আনীত হইলেন।

বাদশাহ রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বহু মৌলবী ও মুসলমান ধর্ম্ম-বেত্তাদিগের সহিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। নানক তথায় উপস্থিত হইলে, মৌলবীগণ এবং স্বয়ং বাদশাহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মৌলবীগণ, বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ বিচারের অবতারণা করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্যতা ও সারবত্তা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথার প্রত্যুত্তরে নানক কহিলেন,—আপনারা অনর্থক ভ্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন না। বিচার ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে, চরম সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল হইয়া থাকে। তাহাতে কোন পক্ষই সত্যের সুফল লাভ করিতে পারে না। তাহাতে কেবল বৃথা বিতণ্ডা কলহ বর্দ্ধিত হয়।

মৌলবীগণ কহিলেন,—তুমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কাফের। তোমার সহিত আবার ধর্ম্ম বিচারের প্রয়োজন কি? তুমি যদি ধর্ম্মের সত্য পন্থা

অবলম্বন করিতে প্রকৃত বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে একটু বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখ; তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, জগতের মধ্যে একমাত্র 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মই সত্য ও সার ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিবেচক মনুষ্যের উহা একান্ত প্রাণে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। একমাত্র পরম পবিত্র স্বরূপ ভগবানের নিকট কেবল এই ধর্ম্মের পথ ধরিয়াই যাওয়া যায়।

নানক কহিলেন,—'আমি আপনাদের ধর্ম্মের কিছুমাত্র নিন্দা বা গ্লানি করিতেছি না। আমি বরং ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই সত্যতা ও সারবত্তা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করি।'

মৌলবীগণ কহিলেন,—'তবে তুমি আর অপর কোন্ সত্য-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছ ও তাহার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ'?

নানক কহিলেন,—'আমি স্থিরভাবে আমার ধর্ম্মের গূঢ়কথা বর্ণনা করিতেছি; আপনারা প্রশান্ত চিত্তে, বিচার বুদ্ধিতে তাহা শ্রবণ করুন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ধর্ম্ম আপনাদের পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে বিশেষ পৃথক কিছুমাত্রই নহে'।

এই বলিয়া মহামতি ভগভক্ত নানক বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদের গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করিলেন—'আমি নিজে এই বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদই একান্ত অন্তঃকরণে বিশ্বাস করি ও তাহাই ভ্রান্ত মূঢ়মতি মানবগণের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি। তাহাদের মধ্যে যে ভাগ্যবান, কেবল সেই তাহা বুঝিয়া থাকে ও সাদরে গ্রহণ করিয়া লয়'।

নানকের মুখে একেশ্বর বাদের গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, বাদশাহ ও মৌলবীগণ নীরব হইয়া স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, নানকের নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম যথার্থ অতি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। উহাই পরম পবিত্র—ধর্ম্ম। উহাই প্রকৃত ইস্‌লাম ধর্ম্মের মুল মন্ত্র।

বাদশাহ কহিলেন,—'নানক! যদি আমাদের ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে তোমার ধর্ম্ম কিছুমাত্র পৃথক না হয়, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে মস্‌জিদে চল। তথায় আমাদের সহিত নমাজ কর ও এক সঙ্গে ভগবানের উপাসনা কর'।

নানক কহিলেন,—মস্‌জিদও অবশ্য ভগবানের পবিত্র মন্দির। তথায় আপনাদের সহিত নমাজ ও উপাসনা করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

বাদশাহ কহিলেন,—'তবে আমাদের সঙ্গে চল।'

এই বলিয়া বাদশাহ, মৌলবী ও মন্ত্রিগণসহ নানককে লইয়া মস্‌জিদে গমন করিলেন।

এই সংবাদ সত্বর নগরে প্রচারিত হইল। অনেকে মনে করিল নানক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য মস্‌জিদে গমন করিয়াছেন।

বহু লোক একত্রিত হইয়া সেই দৃশ্য দর্শন করিতে গমন করিল। মহামতি নানকের মনে কোনই বিকার নাই। তিনি হৃষ্টচিত্তে মস্‌জিদে গমন করিলেন। তথায় একান্তমনে নমাজ করিলেন ও সকল মুসলমানের সহিত ভগবানের উপাসনা করিলেন। অনেকে নানকের সেই সময়ের অবস্থা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল। তিনি তখন ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে কি অপরূপ ভাব—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

বাদশাহ ও অপর মুসলমানগণ বুঝিলেন, নানক যথার্থই মহাভক্ত পরম সাধু পুরুষ। বাদশাহ বিমুগ্ধ হইয়া নানকের মুক্তি দান করিলেন।

নানক মুক্ত হইয়া সত্য ও সার ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দলে দলে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল।

নানকের মন্ত্রশক্তি-স্বরূপ উপদেশ সমূহ—যে ভাগ্যবানের হৃদয়কে

স্পর্শ করিল, তাহারই অন্তরের অন্তস্তল বিগলিত হইল। তাহারই হৃদয়-কন্দর-নিহিত ধর্ম্মভাবের স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে আর সংসার-মোহে মুগ্ধ হইয়া গৃহে স্থির রহিতে পারিল না।

যাঁহারা জগতে সৎ ও শুভ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের অনুচর শিষ্যবর্গ তাঁহাদের এক সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণের শিষ্যবর্গ, সে ধর্ম্ম প্রচারে পরম সহায় দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

মহাপুরুষ নানকের যে সকল শিষ্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তন্মধ্যে ক্রোড়িয়া, বালা ভাই, ভগীরথ, মনুমুখ, মর্দ্দনা প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য প্রথম ও প্রধান। মর্দ্দনা নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও, তাঁহার চিত্ত পরম পবিত্র ও তিনি অতিশয় ভক্ত ছিলেন।

নানক, এই মর্দ্দনাকে অতিশয় স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। নানক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যখন আফগানিস্থানে গমন করেন, তখন এই পরম ভক্ত-প্রবর মর্দ্দনার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যু সংবাদে, শোক-তাপের অতীত মহাপুরুষ নানকও কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভক্তির ভেদনির্ণয়।

নানক পরম ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। ভগবানে ভক্তি এবং জীবে দয়া ও প্রীতিদান তাঁহার মহৎ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই শুভ-ধর্ম্ম, অজ্ঞমূঢ় ও পতিত জনের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র পবিত্র ব্রত হইয়াছিল।

মানবগণ এমন দুর্লভ নরদেহ, নরজীবন লাভ করিয়া কেবল পশুর ন্যায় আহার বিহার ও তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগে নিরত রহিবে এবং পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা তাঁহার পবিত্র হৃদয় কখনই সহিতে পারিল না। মূঢ় মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার দয়া প্রেমপূর্ণ প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে একনিষ্ঠ ব্রতী হইয়া, গৃহের বাহির হইলেন। ভক্তিই মহামতি নানকের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মেরুদণ্ড।

নানকের ভক্তি-ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, ভক্তির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। ভাগবত আদি ভক্তিশাস্ত্র এবং সাধু ভক্তগণের নির্দ্দেশ অনুসারে ভক্তির স্বরূপ বা গূঢ়তত্ত্ব দ্বিবিধ—এক বৈধী, অপর রাগানুগা। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা অনুসারে তদীয় কথায় অনুরক্তি, তাহাই শ্রবণে মননে একান্ত বাসনা ও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পবিত্র পুষ্প পত্র এবং ভজনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা অর্চ্চনার নাম বৈধী ভক্তি। এই ভক্তি—বা ভাবের অনুগামী যিনি, তিনি মনোহর গীত বাদ্যাদি দ্বারাও তাঁহার অর্চ্চনা ও আরতি করিয়া থাকেন। তিনি নিজভাব-প্রাপ্ত ভক্ত-মণ্ডলীর সহিত একত্রে বসিয়া ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করেন এবং তাহাতে পরমানন্দ উপভোগ করেন। বৈধী ভক্তির ইহাই স্বরূপ লক্ষণ।

রাগানুগা ভক্তি, বাহ্যজ্ঞান শূন্য—বাহিরে যেন জড়ভাবাপন্ন। যে ভাগ্যবান ভক্ত সেই মহাভক্তির অধিকার লাভ করেন, তিনি অন্তরে যে কি অপূর্ব্ব স্বর্গ-সুধা উপভোগ করেন, তাহা কেবল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জ্ঞানহীন জড়ভাবাপন্ন উন্মত্তের ন্যায় কখন ভগবৎ মহিমায় অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে রোদন করেন—কখন বা আনন্দভরে হাস্য সহকারে নৃত্য করিতে থাকেন—আবার কখন সমাধিস্থ হইয়া মূর্চ্ছিত ভাবে মৃত্তিকার উপর নিপতিত থাকেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ

ভগবদ্ভক্তি-ভাবে বিভোর থাকেন। তিনি সেই ভক্তি-প্রেমের পরমানন্দে এমনই বিভোর হন যে, জগতের আর কিছুমাত্রই স্পৃহা বা আসক্তি আদৌ থাকে না। কেবল একমাত্র তিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত থাকেন না—স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়াও এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারেন না।

স্থূলতঃ সঙ্ক্ষেপতঃ ইহাই রাগানুগা ভক্তির একমাত্র স্বরূপ লক্ষণ। যিনি মানবজন্ম, মানবদেহ ধারণ করিয়া, এই রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ লাভ করিতে পারেন, তিনিই মহাভাগ্যবান - তিনিই ধন্য। ভগবানের অঙ্গ বা অংশ ভিন্ন কেহ এই উত্তমা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না।

নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ভগবানেরই অঙ্গ বা অংশ বিশেষ। তাঁহারাই এই শ্রেষ্ঠ ভক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই ভক্তিভাবের গূঢ় গভীর তত্ত্ব, সাধারণ প্রাকৃতিক মনুষ্য বুঝিতে পারে না—সাধারণ ভক্তগণও বুঝিতে অসমর্থ।

কখন কখন কালচক্রের গতি অনুসারে এমন ভক্ত মহাপুরুষ, পতিত নর-সমাজকে ভক্তিতত্ত্ব শিখাইবার জন্য জগতে আগমন করেন। তাহাতে জগৎ ধন্য হয়, পতিত মানব সমাজ উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান স্বয়ং এই ভক্তের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ'। বাস্তবিক, এমন যে ভক্ত তিনিই মহাত্মা রূপে পরিগণিত ও পরিপূজিত। জগৎ একবার তাঁহার সন্দর্শন ও পদরেণু লাভ করিতে পারিলে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকে।

নানক, রাগানুগা ভক্তির মহাভাব স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া, সেই সুধা, পতিত জনকে পান করাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

ক্রোড়িয়া, নানকের পরম ভক্ত—প্রিয় শিষ্য ছিল। তাহার প্রাণের গুরু, গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন, ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইল না।

ক্রোড়িয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—গৃহে বাস করিয়া কি গুরুদেব তাঁহার মহান ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবেন না? ক্রোড়িয়া নানকের উপদেশবাণীর মন্ত্রপ্রভাব ও তাঁহার অপূর্ব্ব অদ্ভুত শক্তি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিল। সে মনে করিল—গুরুদেবের অসাধ্য কি আছে? তিনি গৃহে বাস করিয়া—সংসারবাসী হইয়াও অনায়াসে নিজ ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইবেন।

এই মনে করিয়া ক্রোড়িয়া একটি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। সেই অঞ্চলে কর্ত্তারপুর নামক এক গ্রামে একটি অতি বিশুদ্ধ স্থান তাহার মনোনীত হইল।

ক্রোড়িয়া বুঝিল—এই পবিত্র স্থানই গুরু নানকের ভজন-সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই স্থানে রহিয়াই গুরুদেব তদীয় অপূর্ব্ব উপদেশ ও শিক্ষা দান দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারে সমর্থ হইবেন।

বহু অর্থব্যয় করিয়া ক্রোড়িয়া গুরুদেবের জন্য সেই পবিত্র স্থানে একটি মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করাইল। অতঃপর সে গুরুদেবের পদধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—'প্রভো! আমি আপনার জন্য কর্ত্তারপুর গ্রামে একটি সামান্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি যদি নিজ গৃহে বাস না করেন, তবে এই ভবনে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করুন।

নানক, প্রিয় শিষ্য ক্রোড়িয়ার প্রস্তাবিত কথায় বিস্মিত হইলেন। পরে একটু মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—'ক্রোড়িয়া! তুমি কি জান না যে, আমি সন্ন্যাসপথ অবলম্বন করিয়াছি। এই পথে গৃহ-সংসার

স্ত্রী-পুত্রাদি সকলই ত্যাজ্য। সন্ন্যাসীর বিশেষ গৃহ বা বিশেষ আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। সকলই তাহার আপনার আত্মীয়, সর্ব্বস্থানই তাহার গৃহ। বৃক্ষতলও সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহস্বরূপ। আমার পক্ষে এখন সকলই আপনার আত্মীয়-স্বজন—সকল স্থানই বাসের গৃহ।'

'নানকের উপদেশসমূহ শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষের সঙ্গ করিয়া, ক্রোড়িয়ার ভ্রান্তি, মোহ বিদূরিত হইয়াছিল। সে বিনীতভাবে ধীরে ধীরে কহিল—'প্রভো! আমি অতি অধম। আমি আপনাকে আর কি কহিব? আপনি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনি সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, মনই বন্ধনের কারণ। মন হইতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। তাহাতেই মনুষ্যের বন্ধন ঘটে। মন যাহাদের প্রভু, মন তাহাদিগকে বন্ধন করে ও তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় যথেচ্ছ খেলা করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি মনের অধিপতি। চিত্ত কখনই আপনাকে বশীভূত করিতে পারে না। সুতরাং গৃহে বাস করিলে, সে গৃহে কখনই আপনার আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং তাহাতে কখনই আপনার বন্ধন ঘটিবে না।'

ক্রোড়িয়া বারম্বার কাতরকণ্ঠে গুরুদেবকে তাহার নির্ম্মিত গৃহে বাসের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার বারম্বার কাতর অনুরোধ প্রার্থনা, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি নানক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি কতবার কত শিষ্যকে উপদেশে বুঝাইয়াছেন যে, আসক্তি সঙ্গ থাকিতে কখনই প্রকৃত সংন্যাস হইতে পারে না। সঙ্গ আসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য রাজ্যভোগ করিলেও সন্ন্যাস ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

ক্রমে নানকের প্রতিষ্ঠা এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, দলে দলে

বহুলোক আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল।

নানকের দেশভ্রমণ কালের একটি অদ্ভুত ঘটনার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। অত্যন্ত তৃষাতুর হইয়া নানক, বুদ্ধা নামক এক ব্যক্তিকে নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনিতে বলেন। নানকের আদেশক্রমে সে নিকটস্থ পুষ্করিণীতে যাইয়া দেখিল, তাহাতে আদৌ জল নাই। পুকুর একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। সে আসিয়া নানককে সেই সংবাদ কহিল। নানক কহিলেন—'তুমি এইবার যাইয়া দেখ।' বুদ্ধা আবার জলাশয়ে গমন করিল। কি আশ্চর্য্য! বুদ্ধা যাইয়া দেখিল, পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ। বুদ্ধা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নানকের পদতলে পতিত হইল ও তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ পানীয় জলের জন্য বহুদিন হইতে বড় কষ্টভোগ করিতেছিল। হঠাৎ পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা নানকের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া অবশেষে তাঁহার শিষ্য হইল।

এই পুষ্করিণীর নাম 'অমৃতসর'। ইহা শিখদিগের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিপূজিত। নানকের প্রভাবে ঐ পুষ্করিণী উৎকৃষ্ট সলিলবিশিষ্ট হওয়ায়, উহাকে স্থানীয় লোকে 'অমৃতসায়র' বলিয়া থাকে। গুরু রামদাস চতুর্থ শিখগুরু ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ পুষ্করিণীকে অতি বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করেন। তিনি উহার মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির শিখদিগের 'গুরু দবরাট' বা 'দরবার' সাহেব নামে অভিহিত হয়।

দুর্দ্দান্ত আফগান আমেদ শাহ শিখদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া,

গোলাদ্বারা ঐ পবিত্র মন্দিরের ধ্বংস সাধন এবং গো-হত্যা করিয়া ঐ পবিত্র স্থান কলুষিত করে।

তৎপরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ঐ অমৃতসর পুনরায় অধিকার করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন এবং পুনরায় মন্দির গঠন করিয়া, উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। তদবধি এই মন্দিরকে স্বর্ণ-মন্দির বা (Golden Temple) বলে।

অমৃতসর অতি প্রশস্ত জলাশয়, উহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান। সর্ব্বদাই সুন্দর সলিলে পরিপূর্ণ থাকে। শ্বেত প্রস্তরে উহার চারিদিক গাঁথা হইয়াছে। তট হইতে মন্দিরে যাইবার জন্য একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। মার্ব্বেল প্রস্তরে মন্দিরটি গাঁথা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি কক্ষ আছে। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ কক্ষ আছে। তন্মধ্যে শিখদিগের পরম ভক্তির সামগ্রী গ্রন্থসাহেব সংরক্ষিত। গুরু-নানক ও গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'গ্রন্থসাহেব'। শিখেরা অতি ভক্তি-সহকারে ঐ গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন।

কর্ত্তারপুরে কিছুকাল থাকিয়া নানকের মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু কে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু তিনি যোগে এতই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, অনায়াসে কয়েক দিবস কাল অনাহারে অনিদ্রায় যোগাসনে বসিয়া থাকিতে পারিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে সুলতানপুরের নদীতে স্নান করিবার সময় তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত জলমধ্যে স্থিরভাবে কাটাইয়াছিলেন। জল হইতে উত্থিত হইয়া তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। উহা 'বাবা-কীরেব' নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি অনেক সময় এক ভীষণ বনমধ্যে থাকিয়া যোগসাধন

করিতেন। ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্য 'রোরী সাহেব' নামে বিখ্যাত।

সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিকে একই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বালা ও মর্দ্দানা নামক দুই শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। সুলতানের গড়বৃত্ত সেনায় প্রচার করিবার সময় তিনি ইব্রাহিম লোদী কর্ত্তৃক বন্দী হন। এই ঘটনার সাত মাস পরে বাবর, ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করেন। তাহাতে নানক মুক্তি লাভ করেন।

মহাসিদ্ধির ফলে গুরু-নানক ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিন কালের বিষয় জানিতে পারিতেন। এক দুরাচার দস্যু অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তীর্থের পথে যাত্রিনিবাস স্থাপন করে। যাত্রী সেইস্থানে আসিলে দুরচার দস্যু তাহাকে অতি আদর করিত, পরে অধিক রাত্রে সুযোগ পাইলে, যাত্রীকে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিত। নানক দিব্যজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিলেন। হতভাগ্য দস্যুকে বুঝাইয়া তাহার বিবেকজ্ঞান বিকশিত করিলেন ও তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিলেন।

নানক, তীর্থ-পর্য্যটন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি মর্দ্দানা ও ভাইবানাকে সঙ্গে লইয়া পুরীদর্শনে গমন করেন। যাইবার পথে মহানদীর তীরে এক মনোহর উপবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মর্দ্দানা সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নানক যে ভজন-পূজন করিতেন, মর্দ্দানা তাহা গাহিয়া গুরুকে শুনাইতেন; এবং সেই সঙ্গে সকলে গুরুর নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। বহুলোক ইহা দেখিয়া শুনিয়া নানকের পরম ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া উঠিল। অনেকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণে উৎসুক হইয়া উঠিল। তিনি কটকে গমন করিলে সেখানেও তাঁহার এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইল। তথায় চৈতন্য-ভারতী নামে একজন মঠের অধিকারী ছিল। সে

নানকের প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া নানককে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই দুরাচার 'ভৈরব সিদ্ধ' ছিল। সে ভৈরবকে আহ্বান করিয়া কহিল—'তুমি নানককে হত্যা করিয়া আইস।' আদেশ পাইয়া ভৈরব, নানককে হত্যা করিবার জন্য যে বনে নানক অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় যাতায়াত করিতে লাগিল। সে অনেকবার লাঠি লইয়া যেমন আসিতে লাগিল, তেমনি তাহার সর্ব্বশরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং পলায়ন করিতে লাগিল। নানক, ইহা বুঝিতে পারিয়া, মর্দ্দানাকে সঠিক ব্যাপার জানিবার জন্য ভৈরবের নিকট প্রেরণ করিলেন। ভৈরব অনুতপ্ত হৃদয়ে অকপটে সকল কথা খুলিয়া কহিল। অবশেষে মর্দ্দানার হস্তে লাঠি দিয়া নানককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

নানক প্রিয় শিষ্যকে কহিলেন,—'ভৈরব নিজে এই কুকার্য্য করিতে আইসে নাই। সে অন্য দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। এখন সে অনুতপ্ত হইয়াছে।' এই বলিয়া তিনি সেই লাঠি আপন হস্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। সেই লাঠি সজীব হইয়া মহাবৃক্ষে পরিণত হইল; ইহা দেখিয়া তথাকার জনসমূহের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে আসিয়া নানকের পদতলে নিপতিত হইল।

নানক, ভাইবানা ও মর্দ্দানাকে সঙ্গে লইয়া পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। ৺জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তিনি শিষ্যদ্বয়কে লইয়া স্বর্গদ্বারে যাইয়া রহিলেন। শিষ্যদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন কি উপায় হইবে। গুরু নানক বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—'তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমাদের জন্য ভোগের অন্ন নিশ্চয়ই আসিবে।' এই বলিয়া তিনি শিষ্যদ্বয়কে

বুঝাইয়া, সাগর সন্নিধানে ভগবানের ধ্যানে নিরত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব, অস্ত-গমনোন্মুখ হইয়াছেন।

এই সময়ে নানক ভাবে বিভোর হইয়া বহু সুমধুর ভজনগীত রচনা করেন। এখনও সেই অপূর্ব্ব গীত ভক্তের হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে।

ভজন গাহিয়া নানক প্রাণ ভরিয়া ভগবানের স্তব করিলেন, অবশেষে কহিলেন,—'ভগবন্! সকল স্থানেই আপনি ভক্তের সম্মান রাখিয়া থাকেন। এখানে কি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে? এই দাস কি আপনার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইবে?' কাতরকণ্ঠে এইরূপে অনেকক্ষণ স্তব করিয়া মহাভক্ত নানক প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাত্রিকালে তিনি স্বয়ং স্বর্ণ-থালে ভোগের প্রসাদ অন্ন আনিয়া নানকের সম্মুখে প্রদান করিলেন।

প্রসাদ অন্ন লাভ করিয়া নানক কহিলেন—'ভগবন্! আপনি রাত্রিকালে আমাকে প্রসাদ দিয়াছেন; কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করিবে? লোকে আমাকে চোর কহিবে। আপনি ইহার প্রতিকারের বিধান করুন। আর এখানে পবিত্র গঙ্গাজলও নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। ভগবান 'তাহাই হউক' বলিয়া তথায় পদাঘাত করিলেন। ভগবানের পদাঘাতে তথায় একটি কূপ সৃষ্টি হইল। ভগবানের আদেশে তথায় গঙ্গাজল আবির্ভূত হইল। তখন ভগবান তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডারা সুবর্ণ-থালা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরে স্বর্ণ-থালা না পাইয়া তাহারা নানকের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সকল কথা শুনিলেন ও নূতন কূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এখন সেই কূপ বৃহৎ জলাশয় হইয়া গুপ্ত-গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতা রাজা মহাসিংহ পুরী-দর্শনে আসিয়া এই বাটীতে কবাট করিয়া দেন ও এখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন ; এই মঠ শিখযাত্রিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞ নানক সম্বন্ধে এক একটি বিস্ময়জনক প্রবাদ শুনা যায়। তিনি একদা তাৎকালিক নবাবকে দেখিতে যাইয়া কাজীগণের সহিত মস্‌জিদে উপাসনায় গমন করেন। তিনি উপাসনা কালে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি উপাসনা না করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন ?' নানক উত্তরে কহিলেন,—'আপনারাই বা কি করিয়াছেন! আপনি স্বয়ং বেগমের রূপ ধ্যান করিয়াছেন, এবং কাজী সাহেব নিজ কন্যার পীড়ার কথা চিন্তা করিয়াছেন। এ আপনাদের কেমন আরাধনা ?' ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। মুসলমানগণ তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

নানকের বয়স যখন ৭১ বৎসর, তখন তিনি কর্ত্তারপুর গ্রামে যোগাবলম্বন করিয়া সমাধিস্থ হন ও তদবস্থায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ বসনভূষণ সকলই স্বীয় প্রিয়শিষ্য অঙ্গদকে প্রদান করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ ঘটে। বিরোধ মীমাংসার জন্য একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 'শবদেহ' দেখিতে যান। তদনুসারে শবদেহাচ্ছাদিত বস্ত্র উন্মোচিত হইলে সকলে দেখিল, তথায় দেহের কোনরূপ চিহ্নও নাই। সকলে চমকিত হইল। অতঃপর শিষ্যগণ আচ্ছাদন বস্ত্রখানিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া গ্রহণ করেন। এইস্থানে এখনও নানকের সমাজগৃহ আছে। তথায় প্রতিবর্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।